ভগিনী নিবেদিতা

বসুধা চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1957

Original : SISTER NIVEDITA *(English)*
BHAGINI NIVEDITA (*Bengali*)

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিউটি প্রিন্ট, সুলতানী চাণ্ডা, শাহাদরা, নয়াদিল্লি-110055 থেকে মুদ্রিত

সূচীপত্র

জন্মলগ্নের ব্রত	1
গুরুর সঙ্গে পরিচয়	6
নিবেদিতা	15
আত্মসত্তায়	22
ব্রতপালনের পথে	36
স্বাধীনতার সাধনা	46
সম্মুখপথে	53
'বহি তব কর্মভার'	59
সমাপ্তি	64
সমকালে প্রভাব	70
সাহিত্যে অবদান	79

গ্রন্থপঞ্জী

1. *Sister Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda* : Pravrajika Atmaprana ; 2. *Nivedita* : Mme Lizelle Reymond (French) : নারায়ণীদেবী কৃত বাংলা অনুবাদ ; 3. লোকমাতা নিবেদিতা : শঙ্করী প্রসাদ বসু ; 4. *The Complete Works of Sister Nivedita* (Four volumes)

জন্মলগ্নের ব্রত

কয়েক দশক পূর্বে আমাদের এক সুদক্ষ সমালোচক লিখেছিলেন, 'শুধু আয়ার্ল্যাণ্ডের করুণ রসাত্মক সাহিত্যের সঙ্গেই আমরা আমাদের মনের মিল খুঁজে পাই—কারণ, তারাও ছিল আমাদের মতো দীর্ঘকাল জীবনযুদ্ধে পরাজিত, যখনই তারা নিজেদের অধিকারের জন্য প্রবৃত্ত হতো তখনই তাদের পতন ঘটতো।' আইরিশদের স্বাধীনতাসংগ্রাম যে আমাদের ও আমাদের অব্যবহিত পূর্বসূরীদের গভীর প্রেরণা জুগিয়েছিল, এই মন্তব্যে তারই পটভূমি বিবৃত হয়েছে। মার্গারেট নোবল নাম্নী আইরিশ মহিলা যে ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ঐ দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে ঘটনারও ছিল একই পটভূমি। বস্তুত মনে হয়, যেন তিনি ভারতে তাঁর জীবনব্রত পালনের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ও পিতামহী এবং তাঁর মাতামহ—এঁরা সবাই বৃটিশ শাসন থেকে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। তাঁর পিতামহ জন নোবল ছিলেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ওয়েসলীয়ান ধর্মসম্প্রদায়ের একজন যাজক, কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের চার্চের সার্বভৌম ধর্মনেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত থাকেননি। নোবল পরিবার চতুর্দশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে বসবাসের জন্য চলে আসেন। জন্ মার্গারেট নীলাস নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেই মারা যান। স্যামুয়েল রিচমণ্ড ছিলেন তাঁদের চতুর্থ সন্তান; মা'কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন—কিন্তু তা হন কতকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি মেরী ইসাবেল হ্যামিলটন নামে এক প্রতিবেশিনী বালিকাকে বিবাহ

করেন। তাঁদের প্রথম সন্তান মার্গারেটের জন্ম হয় টাইরোন জেলার ডান্ গানন গ্রামে—1867 সালের আঠাশে অক্টোবর তারিখে। পরে প্রামাণ্য সূত্রে জানা গেছে যে, জন্ম মুহূর্তেই তাঁর জননী তাঁকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন।

বৎসরকাল পর স্যামুয়েল ও মেরী স্থির করলেন যে, তাঁরা তাঁদের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে অধ্যয়ন ও মানবসেবাতে আত্মনিয়োগ করবেন; এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা তাঁদের শিশুকন্যাটিকে তার পিতামহীর কাছে রেখে ইংলণ্ড চলে এলেন। সেখানে তাঁরা বাস করতে লাগলেন ম্যাঞ্চেস্টারে—সেখানে স্যামুয়েল ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের দেশের যে সব লোক সেখানে কারখানায় কাজ করতো তাদের ও অন্যান্যদের একসাথে জড়ো করে পাঠ ও আলোচনাচক্র চালাতে লাগলেন। ধর্মপ্রচারকরূপে তিনি কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা অর্জন করতেন। মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে মেরী, মার্গারেট ও মেরী নামে দুটি কন্যা ও রিচমণ্ড নামে পুত্র নিয়ে সংসারে একা পড়ে যান। তখন তিনি তাঁর পিতা হামিলটনের কাছে ফিরে যান। মার্গারেট তাঁর পিতার কাছ থেকে লোক সেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন; তাঁর ঠাকুরদাদা তাঁর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন।

মার্গারেট ও মেরী অতঃপর শিক্ষালাভের জন্য হ্যালিফ্যাক্স কলেজে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁরা মিস ল্যারেটের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মিস ল্যারেট কিছুটা কড়া স্বভাবের হলেও ছাত্রীদের বেশ যত্ন নিতেন, পরে মিস কলিন্স তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কিত কয়েকটি মৌল প্রশ্ন ঐ সময়ে মার্গারেটের মন চঞ্চল করে তুলেছিল। মিস কলিন্সের সস্নেহ যত্নে তিনি সে সব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ও প্রশ্ন উত্থাপন করতে সক্ষম হন। হ্যালিফ্যাক্সে পড়বার সময়েই তিনি সংগীত, শিল্প ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1884 সালে সতেরো বৎসর বয়সে তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি প্রথমে কেসউইকে, তারপর রেক্সহামে শিক্ষকতা করেন। রেক্সহাম ছিল একটা কয়লাখনি অঞ্চল; মার্গারেট সেখানে শিক্ষকতা ছাড়াও গরীব খনিমজুরদের মধ্যে সমাজসেবার কাজ করতে ভালোবাসতেন। এই সময়েই তিনি ওয়েল্‌স্ প্রদেশের এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সংস্পর্শে

আসেন এবং তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন ব'লে স্থির করেন। কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ, এক মারাত্মক রোগে যুবকটির মৃত্যু হয়, মার্গারেটের আর কোনো সঙ্গী থাকল না। তিনি তখন চেস্টারে চলে যান। তাঁর বোন মেরী সে সময়ে লিভারপুলে শিক্ষকতা করছিলেন এবং তাঁর ভাই রিচমণ্ড ছিল সেখানকার কলেজেরই ছাত্র। তাঁদের মা'ও তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে চলে আসেন। মার্গারেট তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন। ঐ সময়ে তিনি শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশুনো করছিলেন। ঐ সব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারক পেস্টালজী এবং জার্মাননিবাসী ফ্রোবেল; ঐ পদ্ধতিতে স্কুলে ভর্ত্তি হবার আগে খেলাধূলা, ব্যায়াম, নানা জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ, অনুকরণ ও গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া হ'তো। শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত বেশ কিছু লোক এর আগেই ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। মার্গারেটের মনেও ঐ পদ্ধতি বেশ আবেদন জাগালো। 'সানডে ক্লাব' নামে একটি ক্লাব সেখানে ছিল; মিঃ ও মিসেস লংম্যান এবং মিসেস দ্য লীউ মার্গারেটকে সেখানে পরিচিত করে দেন। সেখানে তিনি যে সব ভাষণ দিতেন ও লেখা প'ড়ে শোনাতেন সে সব খুব সমাদর লাভ করেছিল। মিসেস দ্য লীউ তারপর তাঁকে লণ্ডনের একটি নূতন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে আহ্বান জানান। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও তাঁর মাকে নিয়ে উইম্বলডনে বসবাস করতে থাকেন। ঐ স্কুলে তাঁর কাজ নীরস ছিল না; তিনি তাঁর ছাত্রীদের খেলাধূলা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে দিতেন। এঁতে তাঁর কাজ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে এবং তিনি একই সঙ্গে নিজের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর ভাই রিচমণ্ডের সঙ্গে বসে সেক্সপীয়ারের রচনা পড়তেন ও আলোচনা করতেন। রেচী উপাধিধারী দু' ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হতো। তাঁদের একজন ছিলেন কবি, অন্যজন সাংবাদিক। অক্টেভিয়াস্ বেটীর 'উইম্বলডন নিউজ' নামে একটা কাগজ ছিল, মার্গারেট তাতে প্রবন্ধ লিখতেন, এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন 'ডেইলী নিউজ' ও 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এ। তিনি 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর খ্যাতিমান সম্পাদক উইলিয়াম ষ্টেডের সংস্পর্শে

এসেছিলেন। 'রিসার্চ' নামে এক বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। লণ্ডনে 'ফ্রি আয়ার্ল্যাণ্ড' নামে এক বৈপ্লবিক সংস্থা ছিল, মার্গারেট লণ্ডনে আসার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাতে যোগ দেন। তিনি সভাতে বক্তৃতা দিতেন এবং দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে তার কয়েকটি সমর্থক গোষ্ঠী গ'ড়ে তোলেন। 'মিউচ্যুয়েল এইড্' নামক পুস্তকের জগদ্বিখ্যাত প্রণেতা ও সমাজ বিপ্লবের প্রবক্তা প্রিন্স ক্রোপটকিন সে সময়ে লণ্ডনে ছিলেন ও উপরোক্ত সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মার্গারেট তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগরক্ষা করছিলেন ও বৈপ্লবিক কাজের পন্থা সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ নিতেন। সে সময় রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভরপুর। কিন্তু প্রিন্স ক্রোপটকিনের অভিমত ছিল প্রত্যেক দেশ অবশ্যই রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে নিজের পরিস্থিতি বিচার করে নিজের পন্থা স্থির করতে হবে। বিপ্লব আনতে হবে দেশের ভেতর থেকে, তা' আকাশ থেকে পড়বে না। মার্গারেট ঐ সব শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

1895 সালের শেষের দিকে মার্গারেট মিসেস লীউয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও তার নাম দেন 'রাস্কিন বিদ্যালয়'। ঐ স্কুলে শুধু শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হতো না; যে সব শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে গবেষণা করতেন তাঁদের কাজের সুবিধাও করে দেওয়া হতো। এমন একজন শিক্ষক ছিলেন মিঃ এবিনেজার কুক। তিনি শিশুদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন এবং তাতে পরীক্ষা নিরীক্ষায় খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। মার্গারেট তাঁর কাছেও শিল্প বিষয়ে শিক্ষা নিতেন এবং তাঁর কাছে যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন তা পরবর্তী সময়ে ভারতে তাঁর শিল্পচর্চার ও শিল্পসমালোচনার উন্নতি বিধানের কাজে লেগেছিলো। এরপর শীঘ্রই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বিস্তৃত হলো, তিনি লেডী রিপনের সংস্পর্শে আসেন। লেডী রিপনের বৈঠকখানা ছিল শিল্প সাহিত্য আলোচনার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিই পরে সিসেম ক্লাবে পরিণত হয়; মার্গারেটও তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। সিসেম ক্লাব সে সময়ের শিল্প ও সাহিত্য জগতের নেতৃস্থানীয়দের দেখাশোনার স্থল হয়ে দাঁড়ায়, যাঁরা সেখানে আসতেন, জর্জ বার্নাড শ ও টমাস হাক্সলীও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এই সময়ে মার্গারেটের ব্যক্তিগত জীবন কোনো কারণে

নৈরাশ্যহত হয় ; তাতে তিনি মিস কলিন্স হ্যালিফ্যাক্সে যিনি তাঁর শিক্ষিকা ছিলেন তাঁর কাছে সান্ত্বনা পেতে চান, ও প্রচুর পরিমাণে তা পানও। শিক্ষিকা ও সমাজ সেবিকারূপে তাঁর পথ এবারে সুনির্দিষ্ট হয়, সেই সঙ্গে চরম সত্যের সন্ধানের ও শিল্পসাহিত্যে সক্রিয় আগ্রহের নিশানাও তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়—এ সবই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। তারপরই ঘটলো এমন একটি ঘটনা, যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং যথাসময়ে তাঁকে এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ করে।

গুরুর সঙ্গে পরিচয়

1895 সালের নভেম্বর মাসের কোনো একদিন মিঃ এবিনেজার কুক কুমারী মার্গারেট নোবলকে লেডী ইসাবেল মার্গেসনের গৃহে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, একজন হিন্দু যোগী এসেছেন, তিনি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করবেন। মিঃ ষ্টার্ডি, হেনরিয়েটা মূলার ও সিসেম ক্লাবের অন্যান্য সভ্যের কাছে কুমারী নোবল জানতে পারেন, সে যোগীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ইংলণ্ডে আসার আগে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন, সে সফর খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। 1893 সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিয়েছেন এবং তা' মার্কিন জনসাধারণকে ঝড়ের মতো ভাবাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি মিঃ ষ্টার্ডি'র গৃহে বাস করছিলেন এবং এর আগেই লণ্ডনে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন। মিস নোবল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, নির্দিষ্ট তারিখে যে সভা হয় তাতে পনেরো-ষোলো জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনে স্বামীজী জাতি-সমূহের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন। দশ বছর পরে মার্গারেট নোবল—তখন তিনি ভগিনী নিবেদিতাতে রূপান্তরিতা হয়েছেন—তাঁর *The Master as I saw him* (আমার প্রভুকে যেমন দেখেছি) নামক বইয়ে লেখেন: স্বামীজী সেদিন 'প্রাচ্যদেশীয় অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ব'লেছিলেন। বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে তিনি একমেবাদ্বিতীয়মেরই বহুধা প্রকাশরূপে চিত্রিত করেন। গীতা থেকে উদ্ধৃতি দেন এবং ইংরাজীতে অনুবাদ করে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।' নিবেদিতা অতঃপর লেখেন: 'মালায় গাঁথা মুক্তোরই মতো সে সব আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে রয়েছে।'

নিবেদিতা আরও লেখেন: 'তিনি বলেন যে, খৃষ্টধর্মে যেমন

প্রেমকে সর্বোচ্চস্তরের ধর্মীয় উপলব্ধিরূপে স্বীকার করা হয়েছে, হিন্দু ধর্মেও তাই।'

'...এবং আমাদের বলেন যে, হিন্দুরা মনে করে মন ও দেহ উভয়ই এক তৃতীয় শক্তিদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সে শক্তি হলো আত্মা। ঐ কথাটা আমার মনে খুবই লেগেছিল, এরই দ্বারা পরবর্তী শীতকালে আমি জীবন ও জগৎ পর্য্যবেক্ষণের নূতন ধারা অবলম্বন করতে প্রণোদিত হই।'

নিবেদিতা আরও লিখেছেন যে, স্বামীজী সে বক্তৃতায় ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্যরূপে আত্মার স্বরাটত্বকেই আদর্শ বলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, পাশ্চাত্যে যে মানবসেবাকে লক্ষ্যরূপে ধারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে স্বামীজীবর্ণিত আদর্শের সংঘাত রয়েছে। তিনি যে সব মত প্রকাশ করেছিলেন সেসব পরস্পর সুসমঞ্জস কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগলো—কারণ তিনি এও বলেছিলেন যে মানবসেবাই সবার আদর্শ হবে, এটাও তিনি সর্বদা আশা করেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বামীজী চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের যাঁরা তাঁর বাণী শুনেছিলেন তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সে বাণীর আপাত-অসামঞ্জস্যের মোকাবিলা করাতে। মার্গারেট নিজেও স্বামীজীর শিক্ষা সরাসরি গ্রহণ করেন নি। তিনি বুঝেসুঝে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সে উদ্দেশ্যেই তিনি স্বামীজী সেই প্রথমবার লণ্ডনে আরও যে দুটি আলোচনাসভায় বসেছিলেন তা শুনতে গিয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি পরে ওই বইয়ে লিখেছিলেন: স্বামীজী যে বলেছিলেন, 'সাধারণত যেভাবে প্রত্যেক ধর্মকেই একমাত্র সত্য ব'লে দাবী করা হয়, কোনো ধর্মই সে অর্থে সত্য নয়। কিন্তু একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সব ধর্মই বাস্তব অর্থে সমান সত্য,' ঐ অভিমত মেনে নিতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভগবান নির্ব্যক্তিক বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দেখলে যে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হয় তাতে তিনি ব্যক্তিস্বরূপান্বিত হ'য়ে যান।' এ কথাতেও মার্গারেট ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হন এবং কথাটি তাঁর মনকে স্পর্শ করে। স্বামীজী মন্তব্য ক'রেছিলেন, যে কোনো কাজের পিছনে যে ভাব থাকে তা কাজটির চেয়েও বেশী শক্তিশালী—মার্গারেট এ কথাও তখনকার মতো মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর সামগ্রিক চিন্তাধারাকে তখনও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। তা

সত্ত্বেও স্বামীজীর চরিত্রগুণ এবং তাঁর প্রচারিত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরের সত্যসন্ধানেও তাঁর যে নিষ্ঠা তা মার্গারেটকে মুগ্ধ করেছিল। এ দু'টি বিষয় মার্গারেটের মন এমনই প্রভাবিত ক'রেছিলো যে সেবার বিবেকানন্দ ইংলণ্ড ত্যাগ করার আগেই মার্গারেট তাঁকে 'প্রভু' ব'লে সম্বোধন করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। স্বামীজী স্পষ্টভাবেই মেনে নিয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে যদি কেউ সত্যিকার সমঝোতাতে আসতে চায়, তবে তাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। তিনি ব'লেছিলেন, 'কেউ যেন এ জন্য দুঃখবোধ না করেন যে তাঁদের আমি আমার মতের সত্যতা উপলব্ধি করাতে পারিনি। আমি নিজে দীর্ঘ ছয় বৎসর আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এসেছিলুম, তার ফল হয়েছে এই যে সে পথের প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার জানা হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার জানা।' তিনি কারু উপর কোনো আত্মিক প্রভাব প্রয়োগ করতে চাননি। যুক্তি, বোধশক্তি ও উপলব্ধিই ছিল তাঁর সত্যসন্ধানের পথ। 'বিশ্বাস' কথাটাতে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন তা'তে স্বীকার ক'রেছেন যে, খৃষ্টীয় ধর্মনীতির বাইরে যে ভাবজগৎ আছে, স্বামীজীই তাঁর মনের জানালা খুলে দিয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মনীতিতে তিনি নিজেও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি দেখতে পেলেন যে, এমন কিছু ভাবকল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'লো যার অন্তর্নিহিত দ্যোতনা ও বিচারের রীতি সম্পূর্ণ নূতন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যায়, তা থেকে স্বামীজী নিজেই যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা এই ভাবকল্পদের অন্যতম। মার্গারেট লিখেছেন : 'পনেরো দিন ধ'রে তিনি এই মরীচিকা দেখেছেন এবং তাকে জল মনে ক'রেছেন। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তিনি দেখেছেন যে এ অবাস্তব ; তিনি আবার যদি পনেরো দিন ধরে দেখেনও, এরপর থেকে তাঁর বরাবরাই জানা থাকবে যে এ মিথ্যা মরীচিকা মাত্র।' মার্গারেট অনুভব করলেন যে, এরকম ভাবকল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। স্বামীজী জ্ঞানের বহর দেখাতে চাইতেন না। অধম ও অধঃপতিতদের উপরে ওঠাবার কোনো ভাণ করতেন না। কিন্তু সবার মধ্যে যা কিছু সর্বোত্তম ও মহত্তম রয়েছে সহজ ভাষায় ও ভঙ্গীতে তার কাছে আবেদন জানাতেন। এ ভাবে তাদের

সত্য দেখতে পাবার শক্তি জোগাতেন—এতেও মার্গারেটের মন প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

স্বামীজী 1896 সালের এপ্রিলে পুনরায় লণ্ডন যান। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ইউরোপ সফরে যেতেন এবং ডিসেম্বরে ভারতে ফিরে আসেন। এরই মাঝে মাঝে তিনি আলোচনা সভায় বসতেন। মার্গারেট তখন তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু কিছু শিক্ষাগ্রহণ করলেন। মার্গারেট তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে, স্বামীজী কখনো কোনো বিশেষ ধর্ম প্রচার করতেন না—সব ধর্মের অন্তর্লীন যে দর্শন—বেদ, উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবলম্বন করে তাই শুধু প্রচার করতেন। বস্তুবাদী দর্শনে যে অস্তিত্বকে শুধু জড়পদার্থের সমষ্টি বলা হয় তা তিনি পছন্দ করতেন। কারণ, ঐ সংজ্ঞানুসারে অস্তিত্ব এক ও অবিভাজ্য—তিনি অবশ্য একে ভগবান নামে অভিহিত করতেন। তিনি বলতেন 'মায়া' কথাটার অর্থ বিভ্রান্তি নয়, বাস্তবকে আমরা যে কুজ্ঝটিকা দিয়ে আচ্ছন্ন করি তাই হ'লো মায়া, 'কারণ, আমরা অনর্থক কথা বলি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি এবং কামনাবাসনার পিছনে ছুটে বেড়াই।' স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'প্রকৃতিকেই মায়া ব'লে জেনো আর জেনো, যে মন এই মায়াকে শাসন করে, তাই স্বয়ং ভগবান।' তিনি আরও বলতেন: 'বেদান্তে বর্ণিত মায়ার অর্থের সর্বশেষ যে ব্যঞ্জনা ঘটেছে তা শুধু চারদিকে বাস্তব যা ঘটছে, আমরা নিজেরা যা এবং চারদিকে যা দেখছি তার সহজ সরল বর্ণনা মাত্র। একে ভেঙে এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারলেই মুক্তি। মানুষকে প্রকৃতির দাস হ'তে হবে এমন কোনো কথা নেই।' আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য—স্বামীজী বেদান্তের এই অর্থের উপরই নির্ভর করতেন।

তাই মার্গারেট নোবল উপলব্ধি করলেন, 'মায়া' বলতে আমরা শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকে বুঝি না, আমরা যা বুঝি ও জানি তার মধ্যে যা কিছু পেঁচানো, ঘোরানো, ভ্রমাত্মক ও স্ববিরোধী, তাই হ'লো মায়া।' বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, গ্রীক উপাখ্যানের ট্যান্টালাসের মুখের কাছ থেকে জলাশয় যেমন ক্রমেই নীচে সরে যেতো এবং তাইতে তার সঙ্গে জগৎ নরকে পরিণত হয়েছিল, এ সংসার বাস্তবে তাই। এ শুধু কল্পনা নয়। এ'ও বাস্তব সত্য যে, এ বিশ্ব-সংসার

সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আবার এও সত্য যে আমরা বলতে পারি না যে, আমরা জানি না। অর্ধজাগ্রত এবং অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলা, সমস্ত জীবনটাই একটা ঝাপসা অবস্থার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া, এই হলো গিয়ে আমাদের প্রত্যেকের অদৃষ্ট। এই হ'লো বিশ্বসংসার। মার্গারেট এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, মায়া বলতে তাই বোঝায়—সেই অর্ধবাস্তব, অর্ধবাস্তব অস্তিত্ব যা ঝিকিমিকি জ্বলছে আবার ক্রমেই মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে নেই বিশ্রাম, নেই তৃপ্তি, নেই চরম নিশ্চিত বলে কোনো কিছু। যাকে আমরা জানি শুধু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। মনের মাধ্যমে যা জানার, তা'ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে (মার্গারেট এখানে আবার বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন) 'আরও জেনো, যা এই সব কিছুকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে তাই স্বয়ং ভগবান।' এই যে দু'রকম ধারণা পাশাপাশি রয়েছে, এতেই সমগ্র হিন্দু ধর্মতত্ত্ব নিহিত—স্বামীজী এ' ভাবেই একে পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।' মার্গারেট দেখলেন, বিবেকানন্দের দর্শন ত্যাগধর্মী। ত্যাগ বলতে বুঝায় কঠোর কৃচ্ছসাধন ও আরাম বর্জন ক'রে চলা—যার দ্বারা আমরা মায়া থেকে দূরে সরে আত্মাকে পৌঁছুতে পারি। এ রকম যে ত্যাগ এ জয়ের অন্য নাম মাত্র। মার্গারেট এখানে স্টিফেনসনের দৃষ্টান্ত দেন—যিনি পরিশ্রমের দ্বারা ও আরাম বর্জন করে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন। বিবেকানন্দ মানুষের চরিত্রকে সবার উপরে স্থান দেন। তিনি এই বিধান দেন যে অসৎকে প্রতিরোধ করা নাগরিকের কর্তব্য আর না করা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর। বৌদ্ধধর্ম মানুষের অহংকে অসত্য জ্ঞান করে এবং বহুকে সত্যজ্ঞান করে। হিন্দু-ধর্ম এককে সত্য জ্ঞান করে এবং বহুকে অসত্য। এ দুইয়ের ভেতরে প্রভেদের প্রশ্নও এ সময়ে উত্থাপিত হয় এবং বিবেকানন্দ এর সমাধান করেন এই বলে যে, বহু এবং এক মূলতঃ একই সত্তা। একই মন বিভিন্ন ভাবে তাকে উপলব্ধি করে। বিবেকানন্দ যে একথা বললেন এতে বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি বাস্তব সত্যকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখছিলেন এবং পরম আত্মার সমস্ত গৌরব ও শক্তি উদ্ঘাটন করে তাঁকে প্রকাশ করছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রকৃতির অস্তিত্ব পরম আত্মার জন্য, প্রকৃতির জন্য পরম আত্মা নয়। সুতরাং যাঁরা

তাঁর কাছাকাছি ছিলেন তাঁদের সবাইকে তিনি বেরিয়ে এসে দুঃখ জর্জরিত জগৎকে প্রেমের দ্বারা সেবা করতে আহ্বান করেন। তাঁর মতে, শুধু ত্যাগধর্মের দ্বারাই মানুষ এমন চেতনাতে পৌঁছুতে পারে, যা দেহকে অতিক্রম ক'রে যায়। এ সত্য উপলব্ধি করতে মার্গারেটের সময় লেগেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি তা উপলব্ধি করতে শুরু ক'রেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, প্রেম বলতে বুঝায় পূর্ণ আনন্দ। সুখদুঃখের মিশ্রণে আবার তাকে অতিক্রম ক'রেই আনন্দ। সুখ যেমন দুঃখও তেমনই আনন্দে রসান্বিত, এর মধ্যে যদি দুঃখ কোনোভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আনন্দের ব্যত্যয় ঘটে। আত্মপর ভেদে ঘৃণাই প্রকাশ পায়। এ কথা মেনে নেওয়া চলতো। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীজী যে ব'লেছিলেন, অপরের মঙ্গলসাধনই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য নয়, আধ্যাত্মিক জীবনই শ্রেষ্ঠ। তার পরের স্থান বুদ্ধিবৃত্তিসঞ্জাত জ্ঞানের এবং তারপর অবশ্য শারীরিক ও জড়জৈবিক প্রয়োজনের স্থান—একথা মেনে নিতে সময় লেগেছিল তার। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধিরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাচ্য-দেশের ঋষিরা সৌন্দর্যের অনুরাগী ; তবু আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে উঠতে পারলে যেন জগৎসংসারকে তাদের অসহ্য ঠেকত। পাশ্চাত্যের সন্ন্যাসাশ্রমে শৃঙ্খলা ও সংগঠন পছন্দ করা হতো ; তা' বলে গেরুয়া-বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রাচ্য সন্ন্যাসাশ্রমে যে দারিদ্র্য প্রকাশ পেতো তা কোনো দিক দিয়ে বিদঘুটে ছিল এমন নয়। তাছাড়া, মানবসেবা বা ঈশ্বর সেবার জন্য প্রয়োজন হ'লে লোকে সমস্ত বাঁধন ও শপথ ভঙ্গ করতো, এরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়েই নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন, এমন নয়। কোনো কোনো সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলতেন আর বলতেন তাঁর সহধর্মিনীর কথা। রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী তাঁর স্বামীকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলতেন যে তাঁর দেশে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কিছু পরিকল্পনা আছে এবং মার্গারেট তা'তে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। একথাতেই মার্গারেট যেন জীবনের সেই আহ্বানের প্রথম ইংগিত পেলেন যা পরে তাঁর জীবনকে বাঞ্ছিত রূপদান ক'রেছিলো। মার্গারেট লণ্ডনকে সুন্দরী নগরীরূপে গ'ড়ে তুলবার কথা বলতেন, প্রত্যুত্তরে স্বামীজী তাঁকে স্মরণ করিয়ে

দিয়েছিলেন অন্যান্য নগরীকে সুন্দর হ'বার জন্য কতটা মূল্য দিতে হয়েছে। ঐ থেকে মার্গারেট অপরের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করেন। মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করার অভিলাষিণী, এ যখন স্বামীজীকে জানানো হলো, স্বামীজী জবাব দিলেন যে, তিনি তাঁর দেশের জনগণের সেবা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যে কেউ সে কাজে তাঁকে সাহায্য করবে তিনি তারই পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। ভারতীয় অভারতীয় তাঁর সব শিষ্যকেই তিনি সমান চোখে দেখে থাকেন। এসময়ে স্বামীজী যেন কোনো এক ঐতিহাসিক ব্রত পালনের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। অন্যদিকে মার্গারেট নোবলের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি যে ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা' আরও এগিয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্যও নির্দেশিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর তখনও একেবারে ঝাঁপ দেবার সময় আসেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে আসার পর মার্গারেট ও মিঃ ষ্টার্ডি লণ্ডনের বেদান্ত কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে সেখানে পাঠালেন। অভেদানন্দও ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। বিবেকানন্দ দেশে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ ক'রেছেন, সে সংবাদও লণ্ডনে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করলো। স্বামীজী তখন রামকৃষ্ণের অনুগামীদের কর্মপদ্ধতি ঢেলে সাজাবার কাজে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। ছয়জন য়ুরোপীয় শিষ্য তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে হিন্দু সন্ন্যাসীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারফলে হিন্দুরা যে গোঁড়ামীর দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সে দেয়াল ভেঙ্গে গেলো। জাতিভেদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও আচার জর্জরিত ভারতীয় সমাজকে শক্তিশালী ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেওয়াই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রায়। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি মঠ স্থাপন ক'রে তাঁর সঙ্গের সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। খুব ক্ষুদ্রাকারেই মঠের পত্তন হয়, অর্থাভাবই তার কারণ। মিঃ ষ্টার্ডি কিছু টাকা পাঠালেন। মার্গারেট ছিলেন মঠ ও তার পাশ্চাত্যদেশীয় শুভার্থীদের মধ্যে যোগসূত্র, তিনি অর্থ সংগ্রহও করেন। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেশ্য ছিল মঠের কার্য্যাবলী লোকহিতে নিয়োজিত করা। কিন্তু সন্ন্যাসীদের সর্বসাধারণের মঙ্গলের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে প্রণোদিত করা সহজ হয়নি, কারণ তাঁরা

নিজেদের ধর্মীয় বিকাশ, নির্জন জীবনযাপন ও তীর্থযাত্রা নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামীজী আরও চেয়েছিলেন যাতে সাধুদের ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে একটা কার্যকরী, ফলপ্রদ সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। তাহলেই গৃহী শিষ্যেরা মিশনের লোকহিতকর কাজগুলো চালিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করতে পারবেন। এ সব বিষয়ে মার্গারেটের সঙ্গে স্বামীজীর নিয়মিত পত্রালাপ হ'তো। মার্গারেট মঠের কাজকর্মের রিপোর্ট পেতেন। নারী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালনা মঠের কাজের অন্তর্ভুক্ত হ'বে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু সময় ব'য়ে চললো। 1897 সালের 23শে জুলাইও বিবেকানন্দ তাঁকে লিখেছেন যে, দীনাহীনা ভারতের জন্য এখনও তাঁকে লণ্ডনেই কাজ করতে হ'বে। যে পর্যন্ত না মার্গারেট স্বামীজীকে লিখে জানালেন যে তিনি লোকসেবার মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে হয় তা' শিখবার জন্য ভারতে আসতে চান, ততদিন তাঁর ভারতে আসার পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লো না। এই চিঠি পড়ে স্বামীজীর ভালো লাগলো। কারণ, এ'তে দেখা গেলো যে মার্গারেট তখন আর তিনি তাকে কিছু দেবেন এই মনোভাব নিয়ে নেই, তিনি এখন শিখতে চান। তিনি তাঁর অহংভাব সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তাই তাঁর ভারতে আসার সময় হয়েছে। স্বামীজী মার্গারেটকে একখানা বেদনাময় চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি মার্গারেটকে সতর্ক ক'রে দিলেন এই ব'লে যে, ভারতে এলে তাঁকে লোকজনের কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বিজাতীয় ও অপ্রীতিকর পরিবেশ—তাতে আবার দাসমনোভাবের নানারকম পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে—এরই মধ্যে বাস করতে হ'বে। তা'ছাড়া তাঁকে বাস করতে হবে একসময়ে বেশী গরম, অন্য সময়ে বেশী শীতের মধ্যে। তিনি তাঁকে এ বিষয়ে কিছু একটা ক'রে ফেলা স্থির করার আগে গভীরভাবে চিন্তা করার পরামর্শ দিলেন। তবে এও বললেন যে মার্গারেট যা-ই সিদ্ধান্ত নিন না কেন, তিনি তাঁকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন। পরবর্তী এক চিঠিতে তিনি মার্গারেটের সামনে উপস্থিত করলেন এমন এক নেতার আদর্শ যে নেতা শুধু ভালোবাসা দ্বারা নেতৃত্ব দেবে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন আসতে দেবে না। মার্গারেট এসব চিঠির বক্তব্যবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন ও নিজের কর্মপন্থা স্থির ক'রে ফেললেন। তিনি যে দেশ ছেড়ে চ'লে

যাচ্ছেন একথা তাঁর মা'কে জানানো কঠিন হ'লো, কিন্তু মা আগেই তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা মেনে নিয়ে তাঁর জন্য প্রার্থনা করছিলেন। মার্গারেটের আরও কয়েক মাস সময় লাগলো প্রস্তুত হ'তে। তিনি রাস্কিন স্কুলের ভার তাঁর বোন মেরীর হাতে হস্তান্তরিত করলেন। তাঁর বন্ধু নীল হ্যামণ্ড এবং অক্‌টেভিয়াস বেটী'র কাছে বিদায় নিলেন এবং এক বৃষ্টিঝরা দিনে জাহাজে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে তাঁকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁর মা, বোন, ভাই, অক্‌টেভিয়াস বেটী ও এবিনেজার কুক। নিয়তিই ভাবতের অভিমুখে তাঁর পথনির্দেশ করলো।

নিবেদিতা

মার্গারেট নোবলকে মাদ্রাজে অভ্যর্থনা জানালেন মিঃ গুডউইন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের একাধারে ষ্টেনোগ্রাফার। শিষ্যা মার্গারেট কলকাতায় পৌঁছুলেন 1898 সালের 18 জানুয়ারী। সেদিন যাঁরা তাঁকে ষ্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বামীজী নিজেও ছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানান। রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটের একটা বাড়ীতে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। সবদিনই স্বামীজী তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য একজন সাধুকে পাঠান। মিসেস সারা বুল ও মিস ম্যাকলিওড নামে স্বামীজীর দু'জন মার্কিন বান্ধবী বেলুড়ে একটা মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আগেই এসেছিলেন, সেখানে এ উদ্দেশ্যে জমিও এর আগেই কেনা হ'য়েছিল। এ দু'জন মহিলা এ কাজের ব্যয়ভার বহন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন; তাঁরা সে জায়গায়ই একটা পুরোনো বাড়ীতে উঠে এসেছিলেন। স্বামীজীর কাছে মার্গারেটের আগমন সংবাদ জানতে পেরে তাঁরা চেয়েছিলেন যে মার্গারেট এসে তাঁদের সঙ্গেই থাকুন। মার্গারেট সে সময়ে সুসংকল্পিতভাবে ভারতীয় পরিবেশে নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে নিচ্ছিলেন, তিনি এই দুই মহিলার কথা মতো তাঁদের সঙ্গে থাকতে এলেন। স্বামীজী অনেক সময়েই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন ও আলোচনা করতেন। এবার তিনি দুটো কাজে আত্মনিয়োগ করলেন: এক, সমাজ সেবায় যাবার জন্য কিছু সংখ্যক ব্রহ্মচারীকে শিক্ষাদান, আর, রামকৃষ্ণানুসারীদের মধ্যে জাতিবর্ণের বিভেদ তুলে দেওয়া। সন্ন্যাস বা বৈরাগী জীবনের প্রচলিত অর্থ ছিল কেবলই ব্যক্তিগত মুক্তির সন্ধান। স্বামীজী যে ব্রহ্মচারীদের সমাজ সেবার শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাতে সন্ন্যাস জীবনের গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটলো।

তিনি যে জাতিভেদ তুলে দিতে চাইলেন তাও দাঁড়াল, যে গোঁড়া আচার ব্যবহার তৎকালে প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। সে বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকীর দিনে বেলুড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মঠ ও রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠিত হল। সেদিনের উৎসবে সমাজের সব জাতি, সব শ্রেণী অংশগ্রহণ করে। মাসখানেক বাদে স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেন। তাইতে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে একজন বিদেশীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'লো। তাঁর নাম বদলে 'নিবেদিতা' রাখা হ'লো। মার্গারেটের নিজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু তাঁকে এই পরিণতিতে আসতে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছিলো। স্বামীজী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, মার্গারেটকে নিজের ব্যক্তিত্ব ত্যাগ না করেই হিন্দুধর্মানুসারী জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মার্গারেটের পক্ষে তা করা সহজ ছিল না। মার্গারেট ভারতে এসেছিলেন নারী শিক্ষার জন্য কাজ করার সংকল্প নিয়ে। স্বামীজীও তাঁকে তাই করতে বলেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে সে কাজ করতে বলার আগে সময় নিতে লাগলেন, এতে মার্গারেট অধৈর্য হ'য়ে পড়ছিলেন। বস্তুত স্বামীজী চাইছিলেন, মার্গারেট আত্মোৎসর্গের ভারতীয় আদর্শানুসারে কাজ করার জন্য নিজে নিজেই প্রস্তুত হোন। মার্গারেট নিবেদিতাতে রূপান্তরিত হওয়াতে তার মনে যে কিছুটা উদভ্রান্তির সঙ্গে উল্লাস সৃষ্টি হ'লো তার মধ্যে স্বামীজী তাঁকে এই ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁর স্ত্রী-শিক্ষার কাজ হাতে নেবার সময় হয়েছে। এরই চারদিন বাদে যে ব্রহ্মচারীটি নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন তাঁকে সন্ন্যাস দেওয়া হলো। তাঁর নামকরণ হলো, স্বরূপানন্দ। স্বরূপানন্দের জীবন ছিল মানুষের দুঃখে-কষ্টে তীব্র সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ, তাতে নিবেদিতার মনে যে দাগ পড়েছিলো, নিবেদিতা নিজেই তার কথা লিখেছেন। বস্তুত স্বরূপানন্দের কাছ থেকেই তিনি ধ্যান-ধারণা শিখেছিলেন। তা তাঁকে শিখতে হয়েছিলো কারণ, তিনি যা হবেন বলে স্বামীজী চাইতেন তার সঙ্গে তখনও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াতে পারেন নি। দীক্ষা গ্রহণের পরেও তিনি স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি বৃটিশ। তাতেই বোঝা গেলো যে তখনও তিনি এ দেশের সঙ্গে তাঁর সত্তা মিশিয়ে দিতে পারেন নি। তা হ'লেও তিনি সেই বহুবাঞ্ছিত পরিণতির কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। বেলুড়ে মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামী

বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়ে ষ্টার থিয়েটারে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ান। তাঁর ভাষণে প্রকাশ পায় যে, তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের তাৎপর্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন। ফলে, সে ভাষণ প্রভূত সমাদর লাভ করে। সেই সভাতে স্বামীজীও ভারতের যে নিজস্ব ধারায় জগতের সামনে নিজেকে বিকশিত ও প্রকাশ করার এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করার ও আপন জনগণের জন্য তা ব্যবহার করার বিষয়ে বলেন। এ ভাবেই তিনি নিবেদিতাকে ভারতের জনগণের কাছে পরিচিত করে দেন। নিবেদিতার জীবনের আরেকটা স্মরণীয় ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যশক্তি সম্পন্না ভার্য্যা সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার; মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলিওডের সঙ্গে তিনি মা সারদামণির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার করেন। এই বিদেশিনী মহিলারা শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করেন তখনকার দিনের পক্ষে সে ছিল এক অসাধারণ ঘটনা; কিন্তু মা তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। গোপালের মা নামে রামকৃষ্ণের এক পুরাতন অনুগামিনী শ্রীশ্রীমা'কে . মা' বলে ডাকতেন, এই মহিলাদের বেলুড় ফেরার পথে তিনি তাঁদের সঙ্গে আসেন। এভাবেই নিবেদিতা হিন্দু সমাজে ও রামকৃষ্ণানুসারী ভ্রাতৃসঙ্ঘে স্থান লাভ করেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে তাতে তাঁর একাত্মতা লাভ তখনও হয়নি। তা অনেকটা হলো তিনি যখন স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথে ও উত্তর ভারতের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করতে গিয়েছিলেন, সেই যাত্রাপথে। 'আমার প্রভুকে যেমন দেখেছি' বইয়ে তিনি স্বামীজীর ধ্যানানন্দ লাভের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সে অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের উপরও এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলো যাতে তাঁর জীবন একটা নির্দিষ্ট গতি পেলো। নইনিতালে স্বল্পকাল অবস্থান ক'রে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা আলমোড়াতে পৌঁছুলেন। সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, মিসেস বুল, মিস ম্যাক-লিওড, মার্কিন বাণিজ্যদূতের স্ত্রী মিসেস প্যাটারসন ও নিবেদিতা। আলমোড়াতে তাঁরা মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার্সের সঙ্গে অবস্থান করেন। এই সময়টাতে নিবেদিতার মনের উপর দারুণ চাপ পড়ে; কারণ তিনি অনুভব করেন যে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ একাত্মতালাভ তখনও দূরে রয়েছে। চাপটা এত নিদারুণ হয় যে, মিসেস বুল হস্তক্ষেপ

করতে বাধ্য হন। স্বামীজী জানান যে, তিনি শান্তিলাভের উপায় সন্ধানের জন্য কয়েকটা দিন অন্যত্র নিজের ভাবে থাকবেন। স্বামীজীর এই ঘোষণা শোনা মাত্র নিবেদিতা তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রণোদিত হলেন। বস্তুত স্বামীজী যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মধ্যে শান্তির কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছিল। অমরনাথ যাত্রায় নিবেদিতার স্বামীজীর সঙ্গী হওয়া হিন্দু জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রভূত সহায়তা করেছিলো। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন স্বামীজীর শিবশক্তি থেকে মাতৃশক্তিতে আত্মোপলব্ধির পরিবর্তন। সে পরিবর্তনে স্বামীজীর আত্মসমর্পণ এতটা সম্পূর্ণ হয়েছিল যে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন—যা' কিছু ঘটছে সবই মা'র কৃপায়, তাঁর নিজের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তখন তিনি নিজেকে অতিক্রম ক'রে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন। নিবেদিতার উপর এসবের গভীর প্রভাব পড়লো। কাশ্মীরে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা' নিবেদিতার মনে গভীর বেদনার ছাপ রেখে গেলো। ঘটনাটা এই—কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজীকে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল সে জমিতে একটা মঠ ও সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্তু কাশ্মীরে বৃটিশ সরকারের যে রেসিডেন্ট বা স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি সে দান বাতিল ক'রে দেন। এই ঘটনা থেকে নিবেদিতা ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। তিনি 1898 সালের পয়লা নভেম্বর কলকাতা ফিরলেন, স্বামীজী তার আগেই ফিরে এসেছিলেন। নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আচারব্যবহার গ্রহণ করলেন। মা সারদামণির মনোভাব আগেই সদয় ছিলো; এবার নিবেদিতা হিন্দু আচারব্যবহার গ্রহণ করাতে তিনি তাঁকে আরও পছন্দ করতে লাগলেন। শুধু তিনিই নন, গোঁড়া মনোভাবসম্পন্না যে সব মহিলা—অধিকাংশই ছিলেন বয়স্কা বিধবা—মা'র সঙ্গে থাকতেন তাঁদেরও এবার নিবেদিতাকে বেশ ভালো লাগলো। নিবেদিতার এবার সময় এলো সর্বদাই যে কাজ তাঁর লক্ষ্য ছিল তা শুরু করবার। যাদের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হবে, স্বামীজীর প্রেরণানুযায়ী তাদের অভ্যাসাদি ও মানসিক প্রবণতাও তিনি অনুশীলন করলেন। কারণ তাদের অভ্যাস ও মানসিক প্রবণতার সঙ্গে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকেও

খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিস্বরূপ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। স্বামীজী নিজেও স্কুলের ছাত্রী সংগ্রহে সাহায্য করলেন। 13 নভেম্বর রবিবার, মা সারদামণি 16 নং বোসপাড়া লেনে স্কুলটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পাড়ার কয়েকটি বালিকাই হ'লো নিবেদিতার প্রথম ছাত্রী এবং শীঘ্রই তারা ও তাদের মায়েরা তাঁর সঙ্গে খাঁটি প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লেন। ভগিনী নিবেদিতা চিত্রাঙ্কন, মাটির কাজ ও সেলাই-শিক্ষার প্রবর্তন করলেন। তিনি যদিও মনে করতেন যে স্কুলের কাজই তাঁর সকল কাজের মধ্যে অবশ্য কর্তব্য, তবুও অন্য কোনো কোনো দিকেও তাঁর কর্মোদ্যম বিস্তৃত করার ডাক পড়তো। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ছিল সে সব কাজের অন্যতম। 9 ডিসেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হবার পর মঠের কাজ সুসংগঠিতভাবে শুরু হয়। নিবেদিতা ব্রহ্মচারী অর্থাৎ নবদীক্ষিতদের উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্কন, শরীরবিজ্ঞান ও সেলাই-শিক্ষা দিতেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভাতে ভাষণ দিতেন, ব্রাহ্ম-সমাজে শিক্ষাসম্বন্ধে বলতেন এবং সেখানে শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-পদ্ধতি শেখাবার ক্লাশ খুলেছিলেন—বহু বিশিষ্ট মহিলা সে ক্লাশে যোগ দিতেন। মার্কিন মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলেও তিনি ইতিহাস শিক্ষাদান করতেন। 1899 সালের 13 ফেব্রুয়ারী তিনি এলবার্ট হলে 'মা কালী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন সে সময়কার একজন গণ্যমান্য বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক। যে বিশিষ্ট সভ্যমণ্ডলীর সামনে নিবেদিতা বক্তৃতা দেন ডাক্তার সরকারও তাতে ছিলেন। তিনি বললেন, তাঁরা যখন এ দেশ থেকে কালীভক্তি জাতীয় কুসংস্কার দূর করার সংগ্রাম করছেন তখন নিবেদিতা কালী মহিমা প্রচার করছেন। তা করা বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে। সভায় উপস্থিত এক ভদ্রলোক একথার জোর উত্তর দেন। ফলে একটা হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়। এমন ঘটনা ঘটার পরেও নিবেদিতা কালীঘাট মন্দিরে কালী সম্বন্ধে বলার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানে বলার আগে একদিন তিনি 'তরুণ ভারত' নামে যে আন্দোলন সে সময়ে চলছিল সে সম্বন্ধে মিনার্ভা থিয়েটারে বলেন। সে ভাষণে উপস্থিত

জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি হয়। স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সে বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত ছিলেন। কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিতা যে বক্তৃতা দেন তাতে কালীপূজার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ছিল। এলবার্ট হলের সভাতে তাঁর মতামত সম্বন্ধে যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, নিবেদিতা তারও জবাব দেন এবং কালীর জননীরূপ ও সংহারিকা মূর্তি—এই উভয়ে কালী চরিত্রের যে প্রকাশ, তার ব্যাখ্যা করেন। নিবেদিতা পরে *Kali, the Mother* বা কালীমাতা নামে যে বই লেখেন এসব বক্তৃতা হলো তারই উপক্রমণিকা। কিন্তু শুধু এসব কাজ ক'রেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। 1899 সালে প্লেগ রোগের সংক্রামক আক্রমণ ঘটে; সে সময়ে তিনি আর্ত জনগণের যন্ত্রনা লাঘবের জন্য যে কাজ করেন তা' সমসাময়িক সবার প্রশংসা লাভ করে। তাদের মধ্যে বর্তমান আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্লেগ রোগাক্রান্তদের সেবায় নিবেদিতা যে সাহস ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখিয়েছে তার প্রশংসা প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। নিবেদিতার ক্রমবর্ধমান মহত্ত্ব এতেই প্রতিভাত হয়।

ইতিমধ্যে যে দেশকে তিনি আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন, স্বামীজীর পরিচালনায় তিনি ক্রমেই সে দেশের আদর্শানুযায়ী গ'ড়ে উঠছিলেন। স্বামীজী যে প্রাণবন্ত এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলছিলেন, তাতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিবেদিতা সে সম্প্রদায়ের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং 25 মার্চ তারিখে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে ব্রতী হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর অর্থ এই যে, সম্প্রদায়ের গোঁড়া সভ্যগণ যতটা খাঁটি তিনিও ততটা খাঁটি ছিলেন। নিবেদিতা সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতেন; স্বামীজী যদিও তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তিনি চাইতেন যে নিবেদিতা সম্পূর্ণ-রূপে হিন্দু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে যে সব সংস্কার ছিল সে সবের বেড়া ভেঙ্গে দেবার জন্যও সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন। হিন্দু সমাজ নিবেদিতাকে গ্রহণ করুক, এ'ও তিনি চাইতেন। সংস্কারগুলো প্রধানত ছিল একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা নিয়ে। কাজেই স্বামীজী লক্ষ্য রাখতেন যা'তে তাঁর ঘনিষ্ঠ যাঁরা ছিলেন তাঁরা যাতে নিবেদিতার হাত থেকে চা ও খাবার গ্রহণ

করেন। নিবেদিতা নিজেই লিখে গেছেন যে, তিনি যা'তে হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হ'তে পারেন সে বিষয়ে মা সারদামণিও সাহায্য ক'রেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা যখন পুরোপুরি সন্ন্যাসিনী রূপে দীক্ষিতা হ'তে চেয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করেননি। যাহোক, নিবেদিতা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে কাজ করছিলেন স্বামীজী সে কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন; কিন্তু অর্থাভাবে সে কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিল। সে কাজে কোনো স্থায়ী ফলও হতে পারছিলনা; কারণ, যে সব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হ'চ্ছিল, তাদের শিক্ষা ফলপ্রসূ হবার আগেই তাদের বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছিল। আরেকটা বাধা ছিল মেয়েকর্মীর অভাব। অভিজ্ঞতার ফলে বোঝা যাচ্ছিল যে এ কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন এমন কর্মী শুধু বিধবাদের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে, তাঁদের থাকার ও কাজের ট্রেনিং নেবার জন্য বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠাও দরকার হ'য়ে পড়েছিল। পরিণামে স্কুলটি বন্ধ ক'রে দিতে হ'লো; এতে নিবেদিতার বিশেষ দুঃখের কারণ ঘটলো।

এ সময়ে স্বামীজী পাশ্চাত্য ভ্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দের যাওয়া ঠিক ছিল; এও স্থির হ'লো যে আমেরিকা ভ্রমণ ক'রে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিবেদিতাও সঙ্গে যাবেন। তাতে তাঁর কিছু অর্থাগম হবে। স্বামীজী তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকায় সমিতি গঠনের পরামর্শ দিলেন। সেবাসমিতির সভ্যেরা তবে মাসিক ছোটোখাটো পরিমাণ চাঁদা দেবেন। 1899 সালের 20 জুন তাঁদের রওনা হওয়া স্থির হ'লো। 18 তারিখের সকালটা নিবেদিতা শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে কাটালেন। সন্ধ্যায় তাঁর সম্মানার্থে বেলুড় মঠে একটা চা পার্টি হলো, তাতে যোগ দিলেন। তারপর তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলেন, সেখানে কয়েক ঘণ্টা প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটালেন। তিনি যখন বাসায় ফিরে এলেন তখন জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। এর আগে তাঁর যে সব সংশয় ও নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে সব কেটে গিয়ে শান্তি ফিরে পেয়েছিলেন। মা সারদামণি 20 তারিখ সকালে স্বামীজী ও অন্য সন্ন্যাসীদের তাঁর বাড়ীতে ডাকেন। সেদিন সন্ধ্যায় যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে অর্ণবপোতে পাশ্চাত্য যাত্রায় বিদায় দিয়েছিলেন। মা সারদামণিও তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

আত্মসত্তায়

বহির্বিশ্বে সেই ভ্রমণ নিবেদিতাকে পৃথিবীতে নিজের পথে চলবার ক্ষমতা দেবে, এই ছিল নিয়তি। তিনি অবশ্য কখনও এমন ভাবতেন না যে তিনি স্বামীজীর পরিচালনা ছাড়া চলছেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁকে নিজের দায়িত্বে কাজ করবার জন্য ছেড়ে দিলেন এবং বুঝতে দিলেন যে তিনি আর তাঁর ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে পড়তে চান না। এর একটা কারণ ছিল তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি—যার ফলে তিনি পার্থিব সব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন এবং দিন দিন বেশী ক'রে শ্রীশ্রীমা'র কাছে আশ্রয় খুঁজতে চাইছিলেন। নিবেদিতার এটা বিশেষ ভালোলাগতো না—কিন্তু তাতে স্বামীজীর সব কিছু থেকে সরে যাবার ইচ্ছা বাড়তো বই কমতো না। যা হোক, লণ্ডনের পথে সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজী নিবেদিতার প্রতি সর্বদা মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস, হিন্দু ঋষি ও অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের বিষয়ে বলতেন। এভাবে নিবেদিতা শুধু যে হিন্দুদের জীবনপ্রণালী ও চিন্তার মর্মে উদ্বুদ্ধ হলেন তাই নয়, তিনি নূতন চিন্তা ও ধারণার প্রেরণা লাভ করলেন। সে সব চিন্তা ও ধারণাই হ'লো তিনি পরে যে সব বই রচনা করলেন সে সবের সারমর্ম। কর্মের ভেতর দিয়ে জনগণের কাছে স্বামীজীর বাণী পৌঁছে দেওয়া তিনি নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করতেন।

31 জুলাই তাঁরা লণ্ডনে পৌঁছুলেন। তাঁদের অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মিস ক্রীশ্চিন গ্রীনস্টাইডেল ও মিসেস ফাঙ্ক। তাঁরা এজন্য সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। পরবর্তী জীবনে মিস গ্রীন-স্টাইডেল নিবেদিতার কাজে সাহায্য করার জন্য ভারতে আসেন। এবার স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা নিবেদিতার পরিবারের সঙ্গে থাকেন।

তাঁরাও তাঁদের অত্যন্ত সমাদরে রাখেন। বিশেষ ক'রে নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ড স্বামীজীর বিশেষ গুণানুরাগী হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু লণ্ডন ভ্রমণে তাঁদের কিছু নৈরাশ্যের কারণও ঘটলো। কারণ স্বামীজীর পুরোনো বন্ধু ও অনুরাগী মিঃ ষ্টার্ডি ও লণ্ডনে আগে যে স্বামীজীর বন্ধুমণ্ডলী ছিল তাঁদের কয়েকজন তাঁকে পরিত্যাগ করেন। স্বামীজী 16 আগষ্টে আমেরিকা রওনা হ'য়ে যান, কিন্তু নিবেদিতা তাঁর ভগ্নীর বিবাহে যোগ দেবার জন্য লণ্ডনে থেকে যান। নিবেদিতা সেপ্টেম্বরে আমেরিকা পৌঁছে রিজলীর জমিদারীতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। জমিদারীর মালিক মিঃ ও মিসেস লেগেটের নিমন্ত্রণক্রমে স্বামীজী সেখানেই বাস করছিলেন। জমিদারীটি স্বামীজীর সঙ্গী ও অনুরাগীদের দেখাশোনার স্থান হ'য়ে দাঁড়ালো, তা'তে সবাই আনন্দ পেতেন। অন্যদিকে নিবেদিতা তাঁর কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘকাল নির্জনে থাকা এবং গাউনের আকারের একটা সাদা-সিধে পোষাক পরাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা এবং এজন্য তিনি স্বামীজীর আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। স্বামীজী 'শান্তি' নামে একটা কবিতা রচনা করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইরের দিকের একটা ঘরে উঠে যান এবং সেখানে *Kali, the Mother* (মা কালী) নামক বই রচনা সম্পূর্ণ করেন। এ বই তিনি উৎসর্গ করেন দেবসেনা-বাহিনীর প্রভু বীরেশ্বরকে। এই সময়েই স্বামীজী তাঁকে নিষ্কাম কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেন, তার অর্থ নিজের জন্য কোনো প্রত্যাশা না রেখে কাজ করা। এ ছিল এক কঠোর শিক্ষা। স্বামীজী নিবেদিতার সামনে শিবের ধারণা তুলে ধরেন। শিবের কাজ কঠোর নিষ্ঠাবান কর্মী তৈরী করা; আর তুলে ধরেন শুকদেবের আদর্শ, যে শুকদেব উপলব্ধির উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিলেন। এ সময়ে নিবেদিতার কাজ ছিল কঠিন। তাঁকে তো ভারতে তাঁর কাজের জন্য অর্থোপার্জন ক'রতে হ'তোই; তাছাড়া মার্কিন জনসাধারণকে ভারতীয় নারীর আদর্শের পরিচয়ও দিতে হ'তো। একদিক দিয়ে তাঁকে স্বামীজী কয়েক বৎসর আগে যে কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন সে কাজই চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। স্বামীজী ন্যু-ইয়র্ক রওনা হ'য়ে গেলেন, নিবেদিতা গেলেন শিকাগো। সেখানে তাঁর প্রথম কাজ হ'লো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে ভারত সম্বন্ধে বলা। তিনি তাদের কাছে

শিশু খৃষ্ট ও হিন্দু পুরাণের ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও গোপাল সম্বন্ধে বললেন। এভাবে তিনি যে শিশু খৃষ্টের বিষয় শিশুরা জানতো তারই পাশা-পাশি ভারতীয় শাস্ত্রের শিশুমূর্তিকে উপস্থিত করলেন। তিনি তাদের ভৌগলিক ভারত সম্বন্ধেও শিক্ষা দিলেন। তাঁর পরবর্তী বক্তৃতা হ'লো মিশনারীদের এক পর্ষদের সামনে ভারতীয় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে। যে বাড়ীতে তিনি ছিলেন সেখানে ভারতের ধর্মজীবন বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। 'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা' সম্বন্ধে নিবেদিতার আরেকটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা হ'লো। তারজন্য চাঁদাও তোলা হয়। এ সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো এলেন ও নিবেদিতাকে তাঁর বক্তৃতা প্রস্তুত করতে সাহায্য করলেন। তিনি জর্জ হেইলের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বক্তৃতাটি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হ'লো এবং নিবেদিতা তার জন্য পঞ্চাশ ডলার পেলেন। তাঁকে অনেক ঘরোয়া আলোচনায়ও যোগ দিতে ও প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লো। প্রশ্নগুলোর অনেকগুলোর পিছনে ছিল গূঢ় মতলব এবং বিরুদ্ধ মনোভাব থেকেই সেগুলো করা হয়েছিল। এতে অনেক সময়েই নিবেদিতার মন খারাপ হ'তো কারণ তাঁর প্রকৃতি ছিল আবেগপ্রবণ। বিবেকানন্দ শিক্ষাদান ও তাঁর নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা নিবেদিতার অন্তরে সাহস ও ধৈর্য সঞ্চার করতেন। তাঁর নিজেকেও নানা পরীক্ষা ও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছিল। তাঁর বোধ হচ্ছিল যে তাঁর বিরাট কাজ রয়েছে, আয়ুও বেশী অবশিষ্ট নেই। আমেরিকায় আরও বেদান্তকেন্দ্র খোলবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন তা' ফলপ্রসূ হ'লো না। ভারতে তাঁর কাজের জন্য যে টাকার প্রয়োজন ছিল তাও অপূর্ণ রইলো। নিবেদিতা দেখলেন তাঁর কাজও সহজ নয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল হিন্দু জীবনদর্শন প্রচারের এবং টাকা তোলার জন্য নানা কেন্দ্রে কমিটী গঠন করা। জর্জ হেইলের কন্যা মেরী হেইলকে তিনি বলেছিলেন ডেট্রয়টে যে কমিটী গঠিত হচ্ছিল তার সম্পাদক হ'তে, কিন্তু মেরী সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। এসব অভিজ্ঞতা নিবেদিতাকে বুঝিয়ে দিল যে তাঁকে নিজের জোরেই চলতে হবে এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করতে হবে। নিজেকে শুধু তাঁর গুরু বিবেকানন্দের বাণীর বাহক মনে করলে চলবে না। এ অবস্থায় নিবেদিতা মিস ম্যাকলিওডের কাছে সান্ত্বনা যাচ্ঞা করলেন। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

একটি চিঠিতে মিস ম্যাকলিওড তাঁকে নিজের জোরের উপর নির্ভর করতে ও কালীমাতার কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে বললেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, মৃত্যুই আমাদের লক্ষ্য; পার্থিব সাফল্য লক্ষ্য নয়। স্বামীজীর সেই বাক্য সার্থক করার জন্য তিনি নিষ্কাম কর্মের আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

এবার তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে নামলেন। তিনি গেলেন এ্যান আর্বার ও জ্যাকসনের কাছে। এই জায়গার মেয়েরা তাঁকে নিয়মিত চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সব জায়গায় তাঁর তেমন প্রতিশ্রুতি পাওয়ার সৌভাগ্য হলো না। ডেট্রয়টে তাঁকে মুখোমুখী হতে হলো এমন কিছু মহিলাদের যাঁরা ভারতীয় জীবন ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রশ্ন করতে লাগলেন, বিশেষ ক'রে যেসব মহিলা খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাই এমন প্রশ্ন করলেন। ঐ সব প্রশ্নের তিনি কড়া জবাব দিতেন। তিনি হিন্দু রীতিনীতি জোরের সঙ্গে সমর্থন করা কর্তব্য মনে করতেন এমন কি তা করতে গিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করলেন যে আধুনিক কালের পটভূমিতে বিচার করলে তা অদ্ভুত বোধ হবে—তিনি বহুবিবাহ পর্য্যন্ত সমর্থন করলেন এই বলে যে তা'তে বিবাহবিচ্ছেদ নিবারিত হবে। বাস্তবিক প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন আক্রমণাত্মক ভাব থাকতো যে তা সহ্য ক'রে যাওয়া যেতো না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে যেতে লাগলেন। নিবেদিতা শিকাগোতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে অনেক স্কুল ঘুরে দেখলেন। মিঃ পার্কার নামে এক ভদ্রলোক শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য এক স্কুল করেছিলেন, নিবেদিতা একটি হিন্দু বালিকা সে স্কুলে পাঠাবার পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনায় কাজ হলো না কারণ, সন্তোষিনী নামে যে বালিকাটিকে পাঠাবার কথা ছিল তার বিয়ে হ'য়ে গেলো। নিবেদিতা কানসাস্ শহর, মিনিয়েপোলিস এবং তারপর বোষ্টনের অন্তর্গত কেমব্রিজে যান। সেখানে তিনি থাকেন মিসেস সারা বুলের সঙ্গে এবং তাঁর দেখা হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে। শ্রীপাল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। নিবেদিতার প্রচেষ্টায় আমেরিকায় 'লোকসহায়ক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সভানেত্রী হলেন মিসেস ফ্রান্সিস এইচ লেগেট, মিসেস বুল হলেন

অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক। মিসেস বুল ছিলেন প্রখ্যাত নরওয়ে-দেশীয় বেহালাবাদক মিঃ ওল বুলের বিধবা স্ত্রী। মিস ক্রিশ্চীন গ্রীন-ষ্টাইডেল নাম্নী এক মহিলার লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তিনিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ডেট্রয়স্থ কমিটীর সেক্রেটারী হন। এই কমিটী 'রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রকল্প' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে; নিবেদিতাই এটি রচনা করেছিলেন। মিঃ লেগেট নিবেদিতাকে পুস্তিকাটির প্রকাশে সাহায্য করেন এবং তাঁর স্ত্রী পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার প্রারম্ভে এক হাজার ডলার দান করেন। স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ নিবেদিতার মনে ছিল এবং সে আদর্শকে তিনি যে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন, পুস্তিকাটিতে তা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল নিবেদিতা সে সবের যে উত্তর দিয়েছিলেন সে সবই পুস্তিকাটির পরিশিষ্টে সংযোজিত ছিল। এই সময়ে নিবেদিতা *'Kali, the Mother'* প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলেন; তিনি আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে কিছু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র সম্বন্ধে মুখে মুখে ব'লেছিলেন; তখন তিনি সে সব বিষয়েও লিখলেন। স্বামীজীও ঐ সময়ে কিছু চরিত্র-চিত্রণ লিখে রেখেছিলেন। ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত জ্যামেইকাতে 'স্বাধীন ধর্মসমিতি' নামে এক সংস্থা ছিল; নিবেদিতা তাতে 'প্রাচ্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই তাঁকে বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'তো, কিন্তু তিনি সব সময়েই স্বামীজীর কাছে উৎসাহ লাভ করতেন। নিবেদিতা ন্যু ইয়র্কে গেলেন, স্বামীজীও পরে সেখানে যান। নিবেদিতা সেখানে স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। বহু বৎসর আগে লণ্ডনে স্বামীজীর ভাষণ শুনে নিবেদিতা যে প্রেরণা পেয়েছিলেন সে অনাদি জীবনের উপলব্ধিতে উদ্ভূত প্রেরণা; এবারকার বক্তৃতায় তিনি নূতন ক'রে তেমনই প্রেরণা লাভ করেন। তিনি নিজে 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' ও 'প্রাচীন ভারতীয় কলাশিল্প' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ঐ সব বক্তৃতায় লোকের মনে বিশেষ ছাপ প'ড়েছিল।

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডস্ ছিলেন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ। প্যারিসে এ সময়ে এক বিশ্বপ্রদর্শনী হচ্ছিল; সে উপলক্ষে ধর্মের

ইতিহাসবিষয়ক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; গেডস্ তাতে আন্তর্জাতিক সমিতির বিবিধ অধিবেশনের সংগঠক ছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে সে কাজে তাঁকে সাহায্য করার আহ্বান জানান। স্বামীজীও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন এবং নিবেদিতা যাবার পর তিনিও সেখানে যান। তার আগে নিবেদিতা ন্যু ইয়র্কে 'ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক প্রণালী, বিষয়ে অধ্যাপক গেডসের এক বক্তৃতা শুনেছিলেন; সে বক্তৃতায় অধ্যাপক গেডস্ 'মানবজাতির উপর বিশেষ স্থানের প্রভাব' যে ভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন তা নিবেদিতার বিশেষ ভালোলাগে। নিবেদিতা বিষয়টি যেভাবে বুঝে নিয়েছিলেন, অধ্যাপক গেডস্ তার প্রশংসা করেন। কিন্তু উপরোক্ত কংগ্রেসে গেডস্ যে কাজ নিবেদিতাকে দিতে চেয়েছিলেন, তা নিতান্তই গতানুগতিক ধরণের। নিবেদিতা দেখলেন যে, সে কাজে অংশগ্রহণ ক'রে তাঁর কোনো প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার অবকাশ নেই। তাই তিনি সে কাজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ও তাঁর মধ্যে পারস্পরিক গুণানুরাগের যে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল তা অব্যাহত রইলো। পরবর্তী সময়ে *The Web of Indian Life* (ভারতীয় জীবনের বুনট) বই রচনায় নিবেদিতা অধ্যাপকের কাছে যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা স্বীকার করেন এবং অধ্যাপক গেডস্ বাস্তব অবস্থার যে ব্যাখ্যা করেন তারই ভিত্তিতে নিবেদিতা যেভাবে ভারতীয় জীবনের ছক গেঁথে তুলেছিলেন, অধ্যাপক তার বিশেষ প্রশংসা করেন। এই সময়ে ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্তা বসুও প্যারীতে ছিলেন। ডক্টর বসু উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে যে বিরাট কাজ করেছিলেন তার স্বীকৃতি লাভের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। নিবেদিতা সে কাজে অতীব আগ্রহ দেখান এবং সে সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায়। ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যেসব বক্তৃতা দেন সেগুলো সবাই খুব মূল্যবান মনে করেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁর মনে একটা ক্লান্তি ও ঔদাসীন্যের ভাব এসে যায়। তিনি পরিষ্কারই বলতেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তাঁর আর কাজ করার ক্ষমতা নেই। তিনি এখন চান মা'তে নিজের সত্তা মিশিয়ে দিতে। এ ধরনের কথায় নিবেদিতার মনে দুর্ভাবনার উদয় হয়; অথচ এ সময়েই তাঁর মনে নানারকম কাজের পরিকল্পনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। অধ্যাপক গেড্‌সের সঙ্গে মতামতের সংঘর্ষ ছিল তাঁর

দুঃখের অন্যতম কারণ। তাঁর স্বাস্থ্য ও মনোবলে ভাঁটা পড়লো এবং মিসেস বুলের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি বৃটানির অন্তর্গত লেনিওনের নিকটস্থ পেরোস-গুইনেক নামক স্থানে কিছু সময় কাটান। তিনি মনের শান্তি খানিকটা ফিরে পান কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যে ঔদাসীন্যের ভাব এসে গিয়েছিল তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এবং নির্দেশের জন্য তাঁর কাছে চিঠি লেখেন। স্বামীজী তার উত্তরে জানান যে, বিশেষ করে নিবেদিতার প্রতি তাঁর কোনো বিরূপ ভাব জন্মেছে এ তিনি স্বীকার করেন না, তিনি শুধু চান যে নিবেদিতা স্বাধীনভাবে নিজের পথ ধ'রে চলুক। এ কথায়ও স্বামীজীর ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে মনে ক'রে নিবেদিতা আরও বিচলিত হলেন ; মিসেস বুল নিবেদিতাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন, তিনি বিবেকানন্দকে আসবার জন্য আহ্বান জানান। স্বামীজী মিসেস বুলকে ভালোবাসার ডাকে ডাকতেন 'ধীরা মাতা'। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি আসেন। তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পর পর যে সাক্ষাৎ হয় তাতে নিবেদিতার মনের দুর্ভাবনা দূর হ'য়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে বিবেকানন্দ শুধু চাইছিলেন যে তিনি আর তাঁর উপর নির্ভর না ক'রে নিজের মতো কাজ করুন, স্বামীজী ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন এবং ভারতে ফিরে আসতে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে 'আশীর্বাদ' নামে একটি কবিতা উপহার দেন ; সে কবিতাটি তারপর থেকে সব ভারতবাসীর কানে সত্যের ঝঙ্কার তুলে আসছে :

মায়ের হৃদয় আর সংকল্প বীরের—
দখিনা বাতাসে যেই মৃদু মধুরিমা,
আর্যমন্দির পর যা' নিবসে—পূত, মনোমুগ্ধকর ; তেমনই সবল,
বহ্নিমান—সেই সাথে মুক্ত ও স্বাধীন ;
এসব তোমারি হউক, তার সাথে আরো,
স্বপ্নেও দেখেনি যা কেউ পুরাকালে ;—
হ'ও তুমি ভাবী ভারতের পুত্রদের
একাধারে প্রিয়া, দাসী, বান্ধবী—সকলি।

নিবেদিতার নিজেরও ভারতে ফিরবার আগে ইংলণ্ডে যাবার পরিকল্পনা ছিল। তাঁর রওনা হবার পূর্বদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী তাঁকে বাগানে ডেকে পাঠান এবং বলেন 'জগতে বেরিয়ে পড়ো ; যদি আমি

তোমাকে সৃষ্টি ক'রে থাকি তবে সেখানে তুমি ধ্বংস হ'য়ে যাবে। যদি মা তোমাকে গ'ড়ে থাকেন, তবে বাঁচবে।'

পরদিন সকালে আবার তিনি বিদায় দেবার জন্য বেরিয়ে আসেন। সে সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন—'ইউরোপে সেই আমার তাঁর সম্পর্কে শেষ স্মৃতি। কৃষকেরা বাজারে যেরকম গাড়ী নিয়ে যায় তেমনই একটা গাড়ীতে বসে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন প্রভাতকালীন আকাশের পটভূমিতে তাঁর আকৃতি। তিনি আমাদের লণ্ডনস্থ কুটীরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন হাত দুটি উপরের দিকে তুলে—প্রাচ্যদেশে এ ভাবেই নমস্কার জানানো হয় আবার তা'তে আশীর্বাদও বুঝায়।' এ ভাবেই তিনি নিবেদিতাকে জীবনের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে ও একাকী যাত্রায় যাত্রা করিয়ে দেন।

বস্তুত এ সময়ে নিবেদিতা তাঁর নিয়তির শেষ গতিপথে যাত্রা করলেন। স্বামীজী ভারতে ফিরবার পরেও তিনি ইংলণ্ডে র'য়ে গেলেন—যদিও তা থাকা উচিত হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। আধ্যাত্মিক দিকে তাঁর যেসব আকাঙ্ক্ষা ছিল তার সঙ্গে তাঁর বাস্তব কাজের সামঞ্জস্য করতে পারবেন কিনা সে বিষয়েও তাঁর সংশয় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পিতা ব'লে ডেকেছিলেন এবং তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে স্বামীজী তাঁর সামনে যে আদর্শ রেখেছিলেন, সে অনুযায়ী যাতে জীবনযাপন করতে পারেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে যে সময়টা বাস করেছিলেন এবং পরে স্কটল্যাণ্ড ও নরওয়েতেও গিয়েছিলেন, সে অভিজ্ঞতাও ভারতে তাঁর কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ সময়ে লণ্ডনে ডক্টর জে. সি. বসু'র একটা অস্ত্রোপচার হয় এবং তিনি ও মিসেস বসু কতগুলো অসুবিধার মধ্যে পড়েন। ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস বুল উভয়েই তাঁদের প্রকৃত বন্ধুর মতো সাহায্য দেন। নিবেদিতা ভারতীয় জীবনধারার জোর সমর্থক ও ভারতের স্বার্থের রক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 1901 সালের জানুয়ারীতে তিনি সপ্তাহে তিন দিন লণ্ডনের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন, ভারতীয় নারীদের আদর্শ—এমন কি ভারতে ইংলণ্ডের অকৃতকার্য্যতার স্বরূপ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ধীরে ধীরে তিনি ভারতের সমস্যার রাজনৈতিক দিকটার দিকেও মনোযোগ দিতে থাকেন। স্কটল্যাণ্ডেও তিনি বক্তৃতা দেন।

মিশনারীরা ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করতেন, নিবেদিতাকে সেসবেরও প্রতিবাদ করতে হ'তো। তাতে পাদ্রীরা তাঁর উপর বিষম চটে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সম্বন্ধে একটা বই লেখার সিদ্ধান্ত নেন। লণ্ডনে আরেকটা বক্তৃতা দেবার পর তিনি ভারতে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। মিস ম্যাকলিওড জার্মান হ'য়ে ভারতে গিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে নিবেদিতা দেশে ফেরার জন্য শ্রীশ্রীমা'র অনুমতি সংগ্রহ করেন, কিন্তু কাজের দরুণ তাঁকে আরও কিছুকাল লণ্ডনে থাকতে হয়। মিঃ হক্স নামক জনৈক শিক্ষাবিদের কথায় তিনি ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। 'রিভিউ অফ রিভিউজ' নামক পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক মিঃ ডবলিউ. টি. ষ্টেড তাঁকে ডক্টর জে. সি. বসু'র একটি জীবন-পরিচিতি লিখতে বলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য, বিশিষ্ট মনীষী মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India* চিরায়িত সাহিত্য ব'লে গণ্য ; তিনি নিবেদিতাকে ভারতীয় জীবন নিবেদিতা যেরূপ বুঝেছেন সে অনুযায়ী তার বিষয়ে আরও লিখবার উৎসাহ দেন। সে কারণেই এরপর নিবেদিতা *The Web of Indian Life* নামক বইটির প্রথম অধ্যায়গুলো রচনা করেন। বইটিতে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। অধ্যাপক গেড্‌সের আমন্ত্রণক্রমে নিবেদিতা দেড় মাস ডাণ্ডিতে থাকেন, গ্ল্যাসগোতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে এক বক্তৃতা দেন ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মিশনারীরা যে সব অখ্যাতি রটাতো সে সবের উত্তর দেওয়ার কাজ হাতে নেন। তিনি ভারতে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হওয়া স্বত্ত্বেও এসব কাজে আটকে যান এবং মিসেস বুল নরওয়েস্থ তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলে সেখানে গিয়ে মাস তিনেক থাকেন। সেখানে তখন ওল বুলের একটা ব্রঞ্জে নির্মিত মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হয়। এতে তিনি কিছুটা বিশ্রাম ও শরীর সারাবার সুযোগ পান। নানাক্ষেত্রের বন্ধুরা অবশ্য সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, তবু তিনি সেখানে কিছু কাজের কাজও করতে পারতেন। মিশনারীদের প্রচারের উত্তরে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন তা *West-minster Gazette* পত্রিকায় Wolves among Lambs নামে প্রকাশিত হয়। 1901 সালের 4 সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

ঐ সময়েই ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা এক নূতন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকে বিস্তার লাভ করে। কতগুলো অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে জগতের কাছে ভারতের বাণী অর্পণের পথে ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ভারতে ইংরাজ শাসকেরা ও ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজেরা যে বর্বর ব্যবহার করতেন নিবেদিতা তা প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন। স্বামীজীকে আমেরিকায় যে বিরোধিতা ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল তার অভিজ্ঞতাও নিবেদিতার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হ'য়েছিল। জগদীশ বসু প্যারীতে যে সম্মান পেয়েছিলেন এবং ইংলণ্ডে তাঁকে যে খাটো ও সম্পূর্ণ অবহেলা করার চেষ্টা চলেছিল তাও নিবেদিতা দেখেছিলেন। এসব অভিজ্ঞতা থেকেই নিবেদিতা ভারতকে স্বাধীন করাই যে প্রথম প্রয়োজন সে বিষয়ে সজাগ হ'লেন। তিনি দেখলেন যে ইংলণ্ডে ভারতের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। তিনি মিঃ আর. সি. দত্তের কাছে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করেন। তিনি জানলেন যে, জামসেদজী টাটা একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা অগ্রাহ্য হয়েছে এবং মিসেস আনি বেসান্ত বারাণসীতে একটি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। তিনি প্রিন্স ক্রোপ্টকিনের সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং তাঁর এই বিশ্বাস জন্মালো যে ভারতের গ্রামে যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতেই স্থায়ী সমাজজীবন গ'ড়ে তোলার পথের নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি মনশ্চক্ষে দেখলেন যে ভারত নিজেকে সে ব্যবস্থার ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলছে এবং তারপর যে অবস্থা দাঁড়াবে তা এই : যুদ্ধ নয়। রক্তপাত নয়। একদিন আমরা শান্তভাবে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির কাছে যাবো এবং হাসিমুখে তাঁকে জানাবো যে তাঁকে দিয়ে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। এ আমরা যে ভাবে করবো সে মহৎ পন্থা ধীরে ধীরে উদঘাটিত হবে, এবং তা হবে তখনই যখন গেড্‌স যাকে প্রশান্ত জীবন গ'ড়ে তোলার নীতি বলে অভিহিত করেন তা আমরা নিজের ব'লে গড়ে নিতে পারবো। প্রায় দু'দশক পরে এ কথা কয়টি মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগের কর্মনীতি এবং সেইসঙ্গে গঠনমূলক

কর্মসূচী হিসেবে প্রবর্তন করেন। এ ছিল তারই ভবিষ্যদ্বাণী, কয়েক দশকের মধ্যে সে কর্মসূচীতেই দেশের মুক্তি অর্জিত হয়। ইংলণ্ড ভারতে যে আচরণ করছিল তাতে নিবেদিতা কতটা তিক্তবিরক্ত হয়েছিলেন তা তাঁর এই কথা কয়টিতেই বোঝা যাবে : ভারত ছিল অনুশীলনে মগ্ন, একদল দস্যু এসে তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। তার মনের যে প্রবণতা ছিল তা নষ্ট হ'য়ে যায়। দস্যুদের কি তাকে কিছু শেখাবার আছে? না, নেই। তার এখন দস্যুদলকে তাড়াতে হবে এবং সে আগে যে পরিস্থিতিতে ছিল, তাতে ফিরে যেতে হবে। আমার বোধ হয় যে, তাই হবে এখন ভারতের সত্যিকার কর্মসূচী। তিনি চাইতেন যে প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়েরা ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার জনমতকে এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত ক'রে তুলুন। 'আমরা চাই যে আমাদের এই ধরার ধূলো পর্য্যন্ত আমাদের বাণী বহণ ক'রে নিয়ে যাক...আমাদের করবার আছে শুধু এই যে আমরা এই স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাবো। যেখানে যখন যে পরিবেশ আঘাত নেবার মতো ত্রস্ত হ'য়ে উঠবে সেখানেই আঘাত করবো।' নিবেদিতা নূতন ক'রে দেখলেন যে স্বামীজী যে জাতির মধ্যে মানুষ তৈরী করার কথা ব'লেছিলেন সে কথার গুরুত্ব সবার উপরে। তিনি লিখলেন, 'স্বামীজী ছাড়া কেউ এ সত্য প্রত্যক্ষ করেননি, আর আমি জানি যে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে আমার স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যায় না—বরং তাতে আমার এ স্বপ্নকে রূপায়িত করার প্রয়োজন বেড়ে যায়।' চিন্তা ও কর্মের যে নূতন ধারা তাঁর মনে গ'ড়ে উঠেছিল তা স্বামীজী অনুমোদন করবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল ; কারণ স্বামীজী তাঁর সামনে কর্ম ও চিন্তার যে ধারা তুলে ধরেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মের ধারার প্রভেদ ছিল এবং তাঁর পক্ষে স্বামীজী নির্দেশিত ধারা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। এবার তিনি ভারতে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং হাতের কাজ সারলেন। এক সপ্তাহ তিনি কাটালেন লণ্ডনে বেস্থাম ভগ্নীসঙ্ঘের যে নিরালা আলয় ছিল তাতে। মা সারদামণির বাড়ীর সঙ্গে সেখানকার পরিবেশের মিল দেখে তাঁর ভালো লেগেছিল। কয়েকদিন তিনি কাটালেন অধ্যাপক গেড্‌সের সঙ্গে *Living and Non-living* নামে ডক্টর জে. সি. বসুর বইয়ের সম্পাদনা করে এবং তারপরই সমুদ্রপথে রওনা হলেন। সেবার

মিসেস ওনা বুল ও মিঃ আর. সি. দত্ত তাঁর পথসঙ্গী ছিলেন। মাদ্রাজে তাঁদের জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখানে তাঁরা পৌঁছান 1902 সালের 3 ফেব্রুয়ারী। অভ্যর্থনার উত্তরে নিবেদিতা যে ভাষণ দেন তা লোকের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি যেভাবে বললেন তা'তে মনে হ'লো যে তিনি এ দেশেরই মাটির সন্তান। জাতীয় রীতিনীতি তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং যে দেশকে তিনি আপন ব'লে গ্রহণ করেছিলেন তার মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতাটি দেশের পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। স্বামীজী সে সময়ে বারাণসীতে ছিলেন। তিনি বক্তৃতাটিকে বিশেষ মূল্য দিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও নিবেদিতার সঙ্গে যোগস্থাপন করলেন। এতে গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে যান, তাঁর উপরে নজর বসান ও তাঁর চিঠিপত্র সেনসর করতে থাকেন। এই সময়েই গান্ধীজী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন ও নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন।

কিন্তু নিবেদিতা পূর্বে যেমন স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল খুলতে আগ্রহান্বিতা ছিলেন এখনও তাই ছিলেন। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে এর পরবর্তী সরস্বতী পূজার দিনে স্কুল খোলেন; তার আগে সমারোহ সহকারে পূজা হয়। মিস বেটি নামে এক মহিলা পূর্বে তাঁর দেখাশোনা করতেন, তিনি তাঁর সঙ্গে এ দেশে এসেছিলেন এবং অনেক কাজে লাগেন। মিস ক্রীশ্চিন গ্রীন ষ্টাইডেলের জন্ম হয়েছিল জার্মানীতে। তাঁর পিতামাতা পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসতি করেন। তিনি 1901 সালের এপ্রিল মাসে এ দেশে এসে নিবেদিতার স্কুলে যোগ দেন। কথা থাকে যে যথাসময়ে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করবেন। আগেই বলা হয়েছে যে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় 1894 সালে, ডেট্রয়টে। দু বছর বাদে তিনি মিসেস ফাঙ্ক নামে অন্য এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রার জন্য কষ্ট ক'রে Thousand Island Park-এ যান। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং এক সপ্তাহকাল ডেট্রয়টে থাকেন তখন মিস ক্রীশ্চিন ডাইল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নিবেদিতাকে টাকা তোলার কাজেও সাহায্য ক'রেন এবং ডেট্রয়টে যে কমিটী গঠিত হয় তার সেক্রেটারী হন, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর মধ্যে মানবসেবা

ও ত্যাগের মনোভাব দেখে স্বামীজীর ভালো লাগে এবং তিনি কলকাতা পৌঁছুলে পর স্বামীজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর মিষ্টি ও ধীর স্বভাব নিবেদিতারও ভালো লাগে এবং এতে স্কুলের কাজেও খুব সহায়তা হয়। 23 মার্চ নিবেদিতা ক্লাসিক থিয়েটারে 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মনের প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 1902 সালের গ্রীষ্মকালে নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন মায়াবতী রওনা হ'য়ে যান। কাউন্ট ওকাকুরাও তাঁদের সঙ্গে যান। ইনি ছিলেন জাপানের একজন মহামনীষী ও শিল্পী, জাপানের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার সমিতির সভাপতি এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিরও পরম অনুরাগী। ভারতে এসেছিলেন তিনি মিঃ ওডা'র সঙ্গে। মিঃ ওডা ছিলেন জাপানের এক বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, তিনি এসেছিলেন জাপানে অনুষ্ঠিতব্য এক ধর্মসভায় বিবেকানন্দকে নিমন্ত্রণ করতে। স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে স্বামীজী এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের সানন্দ অভ্যর্থনা জানান। স্বামীজী যখন শেষবার বুদ্ধগয়া ও বারাণসীতে তীর্থভ্রমণে যান, ওকাকুরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এ দেশে দীর্ঘকাল থাকেন এবং *Ideals of the East* নামে একখানা বই লেখেন। নিবেদিতা বইটির সম্পাদনা করেন, একটি পরিচিতিও লিখে দেন। বিশ্বস্ত সূত্রে এও জানা যায় যে ওকাকুরা রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সঙ্গের একদল তরুণের সঙ্গে উত্তর ভারতে গুপ্ত সমিতি গঠনেও তাঁর হাত ছিল। নিবেদিতা যে কেবল এক ভাবধারার প্রচারক হ'য়ে সন্তুষ্ট না থেকে ভারতের জাতীয় জীবনে সে ভাবধারার বাস্তব পরিপূর্ণতার চেষ্টা করেছিলেন, এর মূলে ওকাকুরার প্রভাবও কাজ ক'রেছিলো। মাসখানেকের বেশী হিমালয়ের প্রশান্তি ও নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীরা কলকাতা ফিরে এলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর গুরুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সময় এসে গিয়েছিল। ইউরোপ থেকে ফিরে নিবেদিতা বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন, কিন্তু স্বামজীর শরীর তখন ভালো যাচ্ছিল না। 10 মার্চ মঠে রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী উৎসবের সময়েও তিনি ঘর থেকে বেরোননি। কিন্তু নিবেদিতা সেদিন কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে সে বৎসরই

একদিন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলিওড তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করেন। সেদিন মঠের মাঠে খেলাধূলো হচ্ছিল এবং স্বামীজী জানালা থেকে তা দেখছিলেন। নিবেদিতা 26 জুন মায়াবতী থেকে ফিরে আসেন এবং স্বামীজী পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 29 জুন নিবেদিতা বেলুড় মঠে যান; স্বামীজী সেদিন উপবাসী ছিলেন, তা স্বত্তেও নিবেদিতাকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং নিবেদিতার খাওয়া হ'লে তার হাত ধুইয়ে দেন। যীশুখৃস্ট তাঁর আত্মবলিদানের পূর্বে তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন বলে যে কাহিনী আছে তার আলোকে স্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতার হাত ধুইয়ে দেওয়ার ঘটনার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। নিবেদিতা সেদিন স্বামীজীর সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাল থাকেন। নিবেদিতা পরে মিসেস নীল হ্যামণ্ডের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তাঁর মনে হয়, স্বামীজী সেদিন জানতেন যে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর আর কখনও দেখা হবে না। 4 জুলাই তারিখে তিনি ভালোই ছিলেন ও নিবেদিতাকে সে মর্মে খবর পাঠান। কিন্তু পরদিন সকালেই মঠ থেকে একজন বার্তাবাহক এসে তাঁকে জানান যে স্বামীজীর মৃত্যু ঘটেছে। নিবেদিতা দাহ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহটিতে বাতাস করেন। বিছানার মাথার দিকটা একটি ক্ষুদ্র কাপড়ের টুকরোতে ঢাকা ছিল—হাওয়ায় তা' চিতানল থেকে উড়িয়ে নিয়ে নিবেদিতার পায়ে ফেলে দেয়। তিনি পরম ভক্তিভরে তা তুলে নেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল মিস ম্যাকলিওডকে সেটি দেওয়া। সেই হ'লো তাঁর প্রতি গুরুর শেষ আশীর্বাদ।

ব্রতপালনের পথে

এ সময় থেকে নিবেদিতার একমাত্র লক্ষ্য হ'লো তাঁর গুরু তাঁর ওপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত ক'রেছিলেন তা সার্থক করা। কিন্তু সে ব্রত এখন নূতন দিকে বিস্তার লাভ করছিল। ভারতের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন, এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হ'লো। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠের কোনো সভ্যকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ করতে দেওয়া হতো না। প্রকৃত পক্ষে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর আসল ব্রত রামকৃষ্ণ বা বেদান্তকে নিয়ে নয়, সে ব্রত দেশের জনগণকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করায়। নিবেদিতা তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি নিবেদিতার সে চাওয়াকে মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য এ কথা নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি বেঁচে থাকলে নিবেদিতার সক্রিয় রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়া পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনি নিবেদিতাকে এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য চিঠি লেখেন। নিবেদিতা জবাব দিলেন যে তিনি তাঁর কাজের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদন করছেন। তিনি পত্রিকা মারফৎও জানিয়ে দিলেন যে তিনি এর পর থেকে যা করবেন তা মঠের অনুমোদন বা অনুমতি ছাড়াই করবেন। মিস ম্যাকলিওডের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান যে তিনি শুধু নারীজাতির জন্য কাজে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। নারীজাতির জীবন প্রবাহ তো আপনা থেকেই চিরকাল ব'য়ে চলেছে। তিনি অনুভব করছিলেন যে দেশের সামনে যে সব সমস্যা ও দারিদ্র রয়েছে জাতীয় চেতনাকে সে সবে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর কাজ।

তাই নিবেদিতা দেশকে জানার ও স্বামীজীর বাণী দেশের লোকের কাছে বহন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের

প্রয়াণের অব্যবহিত পরে তিনি স্মৃতিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোরে যান। বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকীতে ক্লাসিক থিয়েটারে মিঃ আর. সি. দত্তের সভাপতিত্বে এক সভা হয়; সেখানেও নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম বক্তা। এরপর তাঁর অসুখ করে ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁর পরিচর্যা করেন। তাঁর নিজের তখন অর্থের অনটন ছিল, তবুও বেশ কিছু প্রতিবেশী মহিলাকে টাকা দিয়ে সাহায্য ক'রতেন। এজন্যই তিনি *The Web of Indian Life* নামে বইটি লেখা শেষ করেন, বইটির বিক্রীও ভালো হয়েছিল। তিনি বোম্বাই যাবার একাধিক নিমন্ত্রণ পেয়ে 22 সেপ্টেম্বর স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে রওনা হন। সেখানে তাঁকে বক্তৃতা দেবার এক বিরাট কর্মসূচী পালন করতে হলো। তিনি যে সব বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন তার মধ্যে ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু মানসিকতা', 'ভারতীয় নারী', 'আধুনিক চিন্তার আলোকে হিন্দু ধর্ম', 'ভক্তি ও শিক্ষা', 'এশিয়ার ঐক্য' ও 'মাতৃপূজা'। 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু মানসিকতা'র উপর বক্তৃতায় তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন যা'তে হিন্দু চিন্তাধারায় তাঁর আস্থা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তিনি বলেন যে, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতোই বিরাট হ'য়ে থাকুক না কেন, হিন্দুদের মন স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের সাহায্যে যে সত্য সন্ধান করেন তার সঙ্গে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানপদ্ধতির তুলনা হ'তে পারে না। কারণ, হিন্দু মনের স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করা যায়। তাঁর সব বক্তৃতাই উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। মিস ম্যাকলিওড এর আগে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, স্বামীজী এক সময়ে বলেছিলেন যে নিবেদিতার বাণী সারা ভারতে ঝঙ্কার তুলবে। মিস ম্যাকলিওডের কাছে এক চিঠিতে নিবেদিতা এ সময়ে লেখেন, এখন তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা'তে মনে হচ্ছে যে স্বামীজীর সে কথা সত্য হ'তে চ'লেছে।

নাগপুর, ওয়ার্ধা ও বরোদাতেও নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন। সেগুলিও সমান সাফল্য লাভ ক'রলো। বরোদাতে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সেই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, তারপরে আরও সাক্ষাৎ হ'য়েছে এবং তার ফলেই রাজনৈতিক কাজে অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সহযোগিতা গ'ড়ে উঠেছে। এরপর তিনি আহমদাবাদে

বক্তৃতা দিলেন এবং কানহেরি গুহা ও এলোরা দেখে এলেন। এলোরা সম্বন্ধে তিনি লিখলেন 'পৃথিবী যতদিন এখন যেমন আছে তেমন থাকবে ততদিন এলোরা থাকবে এমন এক জায়গা হ'য়ে যেখানে ভগবদরহস্য মানুষের আত্মায় প্রকট হ'য়ে তাকে অভিভূত ক'রে ফেলবে—সব মানুষকে, তাদের পারিপার্শ্বিক বা ধর্মমত যা-ই হোক না কেন। ক্লান্তিবোধ করাতে তিনি অবশিষ্ট সফর বাতিল ক'রে কলকাতা ফিরে এলেন। এরপর তিনি চন্দননগরে একটা ও কলকাতায় দুটো বক্তৃতা দেন।

৪ ডিসেম্বর তিনি আবার স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ রওনা হন। ব্রহ্মচারী অমূল্যও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি পরে স্বামী শঙ্করানন্দরূপে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হ'য়েছিলেন। রাস্তায় তাঁরা উড়িষ্যায় খণ্ডগিরিতে যাত্রাবিরতি করেন খৃষ্টমাস পর্বের আগমনী উৎসব পালন কববাব জন্য। যেভাবে তাঁরা তা পালন করেন তা ছিল নিবেদিতা যে এক নূতন আধ্যাত্মিক সমন্বয়ে পৌঁছেছিলেন তারই দ্যোতক। সন্ন্যাসীদ্বয় মেষপালকের পোষাক পরেন, হাতে তাঁদের লাঠি। সন্ত লিউক লিখিত সুসমাচার থেকে তাঁরা প্রাচ্যের বিজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে কাহিনী এবং যে মেষপালকেরা মাঠে রাত্রিবাস করে তাদের কাছে দেবদূতের আগমণীর গল্প পাঠ করেন। যীশুখৃষ্টের মহৎ জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন পর্য্যন্ত তাঁরা পাঠ করেন। দু' হাজার বছর আগে খণ্ডগিরি বুদ্ধের বাণী গ্রহণ ক'রেছিলো; নিবেদিতার বোধ হ'লো যে খৃষ্টের জীবনবাণী সেখানে নূতন গরিমায় গরীয়ান হ'লো।

19 ডিসেম্বর তাঁরা মাদ্রাজ পৌঁছলেন। এই শহরেই স্বামীজী এমন কিছু বন্ধু লাভ ক'রেছিলেন যাঁরা তাঁকে আমেরিকা যেতে সাহায্য করেন; ফিরে এলে পর এখানেই তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। তাই নিবেদিতা এখানে এসে বিরাট আনন্দ লাভ করেন। আবার সে বছরের প্রথম দিকে নিবেদিতা পাশ্চাত্যভ্রমণ থেকে ফিরে এলে এখানেই তাঁকে জনসাধারণ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। স্থানীয় শিষ্যদের অনুরোধ স্বামীজী যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন। সেই রামকৃষ্ণানন্দ সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করুন। *Castle Kennan* নামক গৃহে স্থানীয় একজন ভক্ত মঠের জায়গা দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা এই মঠে থেকেই জনসভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেবার কার্যসূচী পালন করেন। তরুণ হিন্দু সঙ্ঘের উদ্যোগে তিনি ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের ঐক্য স্বতঃস্ফূর্ত জিনিষ ; তা কোনো বিদেশীর দান নয়। তিনি বলেন, 'ভারতের যদি নিজস্ব ঐক্য না থাকে, কেউ তা'কে ঐক্য দিতে পারবে না। ভারতের ঐক্য অবশ্য আছে এবং সে ঐক্যের উদ্ভব আপনা থেকে হয়েছে। সে ঐক্যের একটা নির্দিষ্ট পরিণতি রয়েছে, নিজস্ব ক্রিয়া রয়েছে, বিপুল ক্ষমতা রয়েছে। সে ঐক্য কারু দান নয়।'

এক মহিলাসভাতে তাঁর কথা শোনার জন্য বিপুল জনসমাগম হয় ; কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেননি। তিনি সেখানে এক বাণী পাঠান ; তাতে তিনি সমাজকে নিজের পথে স্থিরনিবদ্ধ রাখতে এবং শক্তিমান, সাহসী ছেলেমেয়ে গ'ড়ে তুলতে মেয়েদের যে দায়িত্ব তার উপর জোর দেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর অনেক বৈঠক হয় ; তাতে তিনি 'ভারতের ঐক্য', 'জাতীয়তাবাদ', 'স্বামীজীর আশীর্বাদ' এবং 'হিন্দু ধর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন। সে আলোচনার ফলে ছাত্রদের অনেকে বেরিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক জায়গায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব সমিতি বেদান্তের বাণী প্রচার এবং সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রেও কাজ করেন। তাদের কাজের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নিবেদিতা একখানা বইও লেখেন।

আলাপচ্ছলে নিজের ভাবনার কথা জানান দেওয়াও ছিল নিবেদিতার কার্যসূচীর এক বড়ো অংশ। তিনি কাঞ্জীভরামে যান, পৌঁছামাত্র ষ্টেশনেই এক আলাপানুষ্ঠান হয় এবং তারপর তিনি কয়েকটি জন-সভায় ভাষণ দেন। তারপর তিনি মাদ্রাজ ফিরে আসেন। 1903 সালে সেখানে স্বামীজীর জন্মদিনের উৎসব নানা অনুষ্ঠানসহকারে সম্পন্ন হয়। তিনি আরও নানা জায়গায় যাবার নিমন্ত্রণ পান, কিন্তু সে সব গ্রহণ করতে পারেননি। উৎসবের পরদিনই তিনি তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে কলকাতা রওনা হয়ে যান। দক্ষিণ ভারতের মানুষ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বাণী যেভাবে গ্রহণ করেছিলো তাতে তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কারণ, এ জন্যে যে বাড়ী পাওয়া গিয়েছিল তার মালিকানা বদল হ'য়ে যায়।

স্কুল সর্বদাই তাঁর ভাবনাতে ছিল, এখন তিনি আবার তাতে মনোনিয়োগ দেবার সময় পেলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রাক্তন পরিচারিকা মিস বেটি স্কুলটির দেখাশোনা করতেন। 1903 সালের মার্চ মাসে ক্রীশ্চিন গ্রীনস্টাইডেল এসে নিবেদিতার সঙ্গে যোগ দেন। নূতন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বই পড়া-জ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে যে সব কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সব এ স্কুলে প্রয়োগ করা হতো। নিবেদিতা প্রত্যেক ছাত্রীর ব্যক্তিগত রেকর্ড রাখতেন। উদ্দেশ্য, তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এরপর একটা মহিলা বিভাগও খোলা হয়, পাড়ার মহিলারা তাতে যোগ দেন। তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিনের বন্ধু সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ এখানে গীতাশিক্ষা দিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু লেখাপড়া শেখাতেন ; মা সারদামণির অন্যতম সহচরী যোগীন মা ধর্মশিক্ষা দিতেন এবং ক্রীশ্চিন দিতেন সেলাই ও সূঁচের কাজের পাঠ। মহিলাদের সকলকেই গৃহকর্ম করতে হতো, তবুও তাঁরা সবাই স্কুলে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন ; এতে তাঁদের মনের দিগন্ত দ্রুত প্রসারলাভ করলো। স্কুলের আঙিনায় চণ্ডী-পুরাণকথা হতো এবং বেশী সংখ্যায় মহিলারা তাতে যোগ দিতেন। মহিলারা ছিলেন গোঁড়া, অনেকেই নিরক্ষর। কাজেই নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন তাঁদের মত, বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে কঠোর সঙ্গতিরক্ষা করেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তাতে যে সাড়া পেতেন তাতে নিজেদের সন্তোষবোধ তো হয়েছিলই, যাঁরা তাঁদের এসব কার্যকলাপের খবর রাখতেন তাঁরাও বিশেষ প্রশংসা লাভ ক'রেছিলেন। ফ্রেটস্‌ম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক মিঃ এস. কে. র‍্যাটক্লিফ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ কাজের সাফল্যের কৃতিত্ব ছিল অনেকটা ক্রীশ্চিনের এবং নিবেদিতা তা সাগ্রহে স্বীকার করতেন। নিবেদিতা নিজেও সেলাই ও সূঁচের কাজ শেখাতেন এবং বড়দের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির ক্লাশ নিতেন। 'বন্দেমাতরম' রোজই গাওয়া হ'তো এবং রোজকার কাজ শুরু করবার আগে রামকৃষ্ণের সুসজ্জিত চিত্রের সামনে সংস্কৃতভাষায় উপাসনা হ'তো। মা সারদামণি মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে যেতেন, তাতে সবাই বিরাট প্রেরণা পেতেন। এভাবে স্কুলের প্রসার হ'তে লাগলো এবং নিবেদিতার সময়েই স্কুলের

জন্য অতিরিক্ত জায়গা নিতে হ'য়েছিল। অতি ক্ষুদ্রাকারে স্কুলের শুরু; গভীর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সে স্কুলই তখন, 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নিবেদিতার পরিকল্পনা ছিল যে দেশকে তিনি নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় আবাস গড়ে তোলা—যাতে স্ত্রী-পুরুষ, দেশী-বিদেশী সকলেই সেখানে জাতীয় শিক্ষামূলক কাজের ট্রেনিং পাবেন। তাঁর আরও পরিকল্পনা ছিল একটি বালসদন গড়া। সেখানকার বালকেরা ছয় মাস অধ্যয়ন করবে এবং ছয় মাস গ্রামে গিয়ে কাজ করবে। ঐসব পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। তবে 1903 সালে বিবেকানন্দ আবাসের এক দল ছেলেকে স্বামী সদানন্দ পিণ্ডারী হিমনদী ভ্রমণে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই ছেলের দলের সঙ্গে পাঠান। নিবেদিতার বক্তৃতা দেওয়ার ও লেখার কাজ আগের মতোই চলছিল, তাতে কোনো বাধা পড়েনি। তিনি কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বক্তৃতা দেওয়ার কর্মসূচী পালন করে চলেছিলেন। সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে তিনি তখন অজস্র লিখতেন।

ঐ সময়ে তাঁর পাটনা ও লক্ষ্ণৌয়ে বক্তৃতা দেবার কর্মতালিকা ছিল। 1904 সালের 4 জানুয়ারী তিনি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে যোগ দেন, দু'দিন পর সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং বিবেকানন্দ স্মৃতিসদনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন। তারপর তিনি স্বামী সদানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা যান। শঙ্করানন্দ ইতিপূর্বে জাপান গিয়েছিলেন; তিনি সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক মহিলা-সভাতে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে বক্তৃতা দেন, মহিলারা সে বক্তৃতার খুব প্রশংসা করেন। নিবেদিতা তিনটি বক্তৃতা দেন ও আলোচনাসভার অনুষ্ঠান করেন। হিন্দু বালসমিতি সরস্বতীপূজার দিনে তাদের বার্ষিক উৎসব করলো, নিবেদিতা সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর যদুনাথ সরকার সভাতে উচ্চ প্রশংসা সহকারে নিবেদিতার পরিচিতি জ্ঞাপন করেন। নিবেদিতা দেশের কাজের জন্য ছেলেদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন। তাঁর বক্তৃতায় প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

ভারতে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি দুটি প্রয়োজনের বিষয়ে বলেন: এক, ভারতীয় নারীর মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠবার মতো যে মহৎ উপাদান রয়েছে তা শিক্ষা দ্বারা ফুটিয়ে তোলা; আর, স্বাধীনতাই যে মূল লক্ষ্য, ছাত্রদের তা স্মরণ রাখা। তিনি বলেন, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে জাতীয় প্রয়োজন সামনে রেখে আর মেয়েদের নাগরিক অর্থে। তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনব্রত।' ঐসব বক্তৃতা জনসাধারণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এরপর নিবেদিতা ভগবান বুদ্ধের সংশ্রবপূত স্থানগুলি দেখতে যান। অল্প বয়সেই তিনি ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণীদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁকে যা বলেছিলেন তাতে বুদ্ধের প্রতি তাঁর ভক্তিও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর দীক্ষা উৎসবের শেষে বুদ্ধমূর্তির চরণে ফুল সমর্পিত হয়েছিল। বাঁকিপুর ছিল প্রাচীন পাটলীপুত্র; সেখান থেকে নিবেদিতা রাজগীরে যান। সেখানকার প্রসিদ্ধ পাহাড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান, সঙ্গীদের নিয়ে এগারো মাইল হেঁটে তিলিয়া স্টেশনে পৌঁছান এবং বুদ্ধগয়ায় উপনীত হন। সেখানে গিয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরের মালিকানা নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তিনি তা মেটাবার চেষ্টাও করেন। জনসভায় এক বক্তৃতা ও বহুলপ্রচারিত এক বিবৃতি—উভয়েতেই নিবেদিতা এ কথার উপর জোর দেন যে বৌদ্ধেরা হিন্দুদের থেকে আলাদা সম্প্রদায় নন এবং এ উভয়ে বিবাদের কোনো কারণ নেই। তিনি বুদ্ধগয়াতে ইতিহাস পঠন-পাঠনের এক স্কুল খুলবেন এমন প্রস্তাবও ছিল, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। বুদ্ধগয়ার পর নিবেদিতা বারাণসীতে সারনাথ দেখতে যান এবং সেখান থেকে যান লক্ষ্ণৌয়ে—সেখানে তিনি বক্তৃতা দেবার এক বিস্তারিত কার্যসূচী পালন করেন। সে সময়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে জনসাধারণের মন আলোড়িত হচ্ছিল এবং নিবেদিতাও সেই ঐক্যসাধনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় ফিরে আসার পরও তাঁকে 'ব্রহ্মচর্য বনাম বিবাহ', 'বুদ্ধ গয়া', 'প্রাণবন্ত ধর্ম' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। হিন্দু বিহাহ একাধারে সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্কার তাঁর এই মত তিনি জোরালো ভাষায় অথচ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন এবং তা লোকের মনে ছাপ রেখে যায়। 'প্রাণবন্ত ধর্ম' বিষয়ে

বক্তৃতায় তিনি ভারতের ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের প্রাণবন্ত রূপ উদঘাটিত করেন। তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন 'এশিয়ায় ইসলাম' সম্পর্কে। এ বক্তৃতা ছিল কলকাতা মাদ্রাসার উদ্যোগে। শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সে বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেন, 'তা হলে ভারতীয় মুসলমানের কর্তব্য কি? আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকা সে কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তার তা থাকার প্রয়োজনও নেই, আরব দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক; তার পূর্বপুরুষেরা নিজেদের বিশ্বাস ও ধৈর্য সহকারে পরিশ্রমের দ্বারাই সে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সে সম্পর্ক আর গড়ে তুলতে হবে না, এখন তার কর্তব্য ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। যে উত্তরাধিকার নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছে তারই মধ্যে রয়েছে প্রবল এক শক্তি। এখন ভারত তার রক্তসম্পর্কের অথবা তার নিজের দেশ, এ দেশের আতিথ্য সে পেয়েছে বলেই এ তার স্বদেশ। এ দেশের জাতীয় ভাবধারায় শক্তি প্রয়োগ করাই তার কর্তব্য।'

এ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সুদূর 1904 সালেই নিবেদিতা ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সংহতি লাভের সঠিক পথনির্দেশ করেছিলেন। তার পরবর্তী দশকগুলিতে সে প্রশ্নেই প্রচুর রাজনৈতিক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে। মার্চ মাসে তিনি বারাণসীতে আরেকটা বক্তৃতা দেওয়ার কর্মসূচী পালন করেন। তিনি ও মিস ক্রীশ্চিন গ্রীষ্মকালে মিসেস সেভিয়ার্সের নিমন্ত্রণক্রমে মায়াবতী যান। ডক্টর বসু, তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীও তাঁদের সঙ্গে যান। (মায়াবতীতেই 1904 সালের 17 মে তারিখে আচার্য বসু তাঁর বিখ্যাত বই *'Plant Response'* লেখা শুরু করেন) তিনি কলকাতায় আরও ভাষণ দেন, 'ভারতীয় শিল্পকলা' সম্বন্ধে দুটি ভাষণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতীয় শিল্পকলা যেভাবে বোঝান ও ব্যাখ্যা করেন তাতেই ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে পরে তিনি যে অবদান রাখেন তার প্রস্তুতি ছিল। তাঁর ভ্রমণ ও বক্তৃতা ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্ম-চেতনা পুনর্জাগ্রত করার অবিরত প্রচেষ্টা। একই বৎসরে তিনি অক্টোবরে বুদ্ধগয়াতে যান। যে সব লোক তাঁর সঙ্গে যান তাঁদেরই দরুণ সে ভ্রমণ বিশেষ স্মরণযোগ্য হয়ে আছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর জে. সি. বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী শঙ্করানন্দ, যদুনাথ সরকার

এবং মথুরানাথ সিংহ নামে পাটনার এক বিশিষ্ট নাগরিক। ভারতীয় উত্তরাধিকারের অন্তর্নিহিত প্রেরণা নূতন করে আয়ত্ত করবার যে চেষ্টা নিবেদিতা করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সে চেষ্টার অংশীদার। তিনি রোজই তাদের ওল্ডারেন প্রণীত অনুবাদে বৌদ্ধধর্ম *(Buddhism in Translation)* এবং এডউইন আর্নোল্ডের *Light of Asia* পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। দিনের বেলায় তাঁরা মন্দিরে বিচরণ করতেন অথবা নিকটবর্তী গ্রামগুলি দেখতে যেতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানে বসতেন। জনৈক জাপানী মৎস্যজীবি সযত্নে অর্থসঞ্চয় করে তীর্থভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর স্তোত্রগানে পরিবেশের গাম্ভীর্য বেড়ে যেতো। একদিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বলেন, তিনি সে যুগের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর সঙ্গীরাও তাতে উদ্বুদ্ধ হন। আরেক সন্ধ্যায় তাঁরা বুদ্ধের সহধর্মিনী সুজাতার গৃহ যে স্থানে ছিল সে স্থান দেখতে যান, বৌদ্ধযুগে সে স্থানের নাম ছিল উবেল-উরু-ভিলা। নিবেদিতা সেখানে সুজাতার জীবনের তাৎপর্য সোল্লাসে ব্যক্ত করেন। বিবেকানন্দের একটা কথা তিনি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করেন—স্বামীজী বলেছিলেন যে আপাতঃ দেখলে বোধ হয় যে, ভারতীয় সমাজ লক্ষ লক্ষ সাধুর এক অকর্মা সম্প্রদায় পুষছে, কিন্তু তারও সার্থকতা আছে। এখানে এ সম্প্রদায়েই মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো লোকের উদ্ভব হয়। তারপর তিনি যুগ যুগ ধরে ভারতের জীবনে যে আধ্যাত্ম স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা উদ্ঘাটন করেন।

সেই সব নয়। বুদ্ধগয়া থেকে চলে আসার আগে নিবেদিতা অস্থির হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, ভারত এখনও আত্মসত্তায় সচেতন নয়, মানব জীবন ও সভ্যতায় তার স্থান ফিরে পেতে প্রস্তুত নয়। তাঁর মনে হলো যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ভারতকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। সেই হলো নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের এক নূতন ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা। সে অধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টাতে অংশগ্রহণেরই অধ্যায়।

স্বাধীনতার সাধনা

ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাননি। সঙ্ঘের নিয়মকানুনে সভ্যদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রকাশ পেলো নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ভারতীয়দের নবজাগ্রত চেতনা ও সে সব অধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের বিক্ষোভ। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই নিবেদিতাকে ব'লেছিলেন যে, আগামী পঞ্চাশ বৎসর ভারতজননীই হবেন তাঁদের একমাত্র পূজ্যা এবং অন্যান্য দেবতার পূজা আসবে তার পরে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর নিজের জীবনও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যেহেতু তিনি বাস ক'রতেন কলকাতায়—যেখানে জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠছিল,—তিনি সে সময়কার সব চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে তাই মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তা থেকেই স্বাভাবিকভাবে বাস্তব কর্মোদ্যোগও গ'ড়ে উঠলো। শাসক শক্তি 1902 সালে দিল্লীতে এক দরবারের আয়োজন করে; জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা সেটা ভালো চোখে দেখলেন না, তাঁরা আগেই আহমদাবাদে নিজেদের সভা করেন ও দরবারকে অর্থের নিরর্থক অপব্যয় ব'লে ধিক্কার দেন। ভগিনী নিবেদিতা খবর পেলেন যে দরবারে ভারতীয় রাজন্যবর্গের নানা অপমানকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি মন্তব্য ক'রেছিলেন যে, এই দরবারের ব্যাপারে ভারতীয়দের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাতে এটাই দেখা গেলো যে তারা অনেকটা রাজনৈতিক ভূয়োদর্শন লাভ ক'রেছে। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়াতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভগিনী নিবেদিতা এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করেন, সেই সঙ্গে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতাতে জনগণের কাছে জাতীয় শিক্ষার উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের

আহ্বান জানান। তিনি যে এসব কর্তব্যের উপর জোর দিয়ে কথা বলতেন এতে জনগণের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের জাতীয় কাজে লাগাবার জন্য কতগুলি সমিতির উদ্ভব ঘটে। সে সব সমিতির মধ্যে প্রধান ছিল সতীশচন্দ্র মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি' এবং সতীশ চন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার পি. মিত্র কর্তৃক স্থাপিত 'অনুশীলন সমিতি'। অন্যান্য সমিতি ছিল 'তরুণ হিন্দু ঐক্য সমিতি, 'গীতা সমিতি' ও 'বিবেকানন্দ সমিতি'। ভগিনী নিবেদিতা এসব সমিতির সবগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে তাদের সভ্যদের অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বিশেষ ক'রে 'জাতি', 'জাতীয় সত্তা' ও 'জাতীয় চেতনা'র উপর জোর দিতেন; এভাবে তিনি জাতীয়তাবাদের বাণী-প্রচারকে পরিণত হন। তাঁর প্রেরণাতে খেলাধূলা, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা যুবকদের শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। তিনি তাদের গুরুস্বরূপ ছিলেন এবং অনেক সময়েই গুণগ্রাহিতার নিদর্শনস্বরূপ বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত মেডেল বিতরণ করতেন।

ডন সোসাইটীই জাতীয় শিক্ষা সমিতি ও জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব কাজকর্মের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতা সে সময়কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল এবং আবদুল রসুল। অধ্যাপক বিনয় সরকার ডন সোসাইটীতে নিবেদিতার কাজ ও প্রভাবের এক বিবরণ লিখে গেছেন। ইনি পরে অর্থনীতিবিদ ও গঠনমূলক চিন্তাবিদরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। অনুশীলন সমিতির বেশী ঝোঁক ছিল রাজনীতির দিকে। চিত্তরঞ্জন দাশ, রাসবিহারী ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়রা সে সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসব সমিতির লক্ষ্য ছিল তরুণ-তরুণীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাদান। এদের কর্মোদ্যোগের মধ্যে ছিল শরীর চর্চার জন্য ব্যায়ামাগার পরিচালনা, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, এবং নানা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম, রাজনীতি ও অর্থনীতি আলোচনার পাঠচক্র; রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ও স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়ার ক্লাস

এবং স্বামী সারদানন্দ, সত্যচরণ শাস্ত্রী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক উপদেশ দান। এদের কার্যকলাপ এক নূতন পর্যায়ে পৌঁছুলো যখন সে সময়ে বরোদাবাসী অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নামে এক দূত পাঠালেন এ সমিতিদেরে বলতে যে তারা যেন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে তাদের কার্যাবলী নূতন ভাবে পরিচালিত করে। এতে সমিতিদের শরীর চর্চা ও সুসংগঠিত আন্দোলনের কর্মসূচী ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন হলো। শ্রীঅরবিন্দ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধীনে এ সব সমিতিকে মিলিয়ে এক করতে চেষ্টা করলেন, সে পাঁচজনের একজন হলেন নিবেদিতা। কিন্তু অরবিন্দ কলকাতায় ছিলেন না, ছিলেন বরোদায়; তাঁর অনুপস্থিতিতে এ পরিকল্পনা কার্যকরী হলো না। যা হোক, তিনি যে পথের নির্দেশ দিলেন অনুশীলন সমিতি সে পথেই গড়ে উঠলো এবং নিবেদিতা তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ প্রয়োজন এবং যেহেতু তিনি ছিলেন কালীসাধিকা সেহেতু সে উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগে তাঁর কোনো বিরূপতা ছিল না। কিন্তু দেশে নানা লাইনে আর যে সব রাজনৈতিক কাজকর্ম চলছিল, সে সবের সঙ্গেও তিনি যোগরক্ষা করতেন। এভাবেই তিনি চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পালেরও বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর 'দি নিউ ইণ্ডিয়া' নামে পত্রিকায় লিখতেন। আর নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তো বটেই, রমেশচন্দ্র দত্তেরও বন্ধু ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাঁর দেশের লোকের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। নিবেদিতা বলতেন "ভারতের বুকে আমি হল চালনা করবো। গভীর থেকে গভীরে, আরও গভীরে যতটা যায় সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছুবো। হোক তা একটা গুপ্ত স্বর যা কোনো একটা গোপন কক্ষ থেকে নিঃশব্দ সংকেত পাঠায় বা একটা ব্যক্তিত্ব যা বড়ো বড়ো নগরীর মধ্য দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে গর্জন ক'রে চলে—তার জন্য আমার কোনো পরোয়া নেই। কিন্তু যে ভগবান আমার ডান হাতটা চালান তিনি যেন এটুকু করেন যে পাশ্চাত্যসুলভ অর্থহীন ক্রিয়াকলাপে আমি আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস যেন নষ্ট করে না ফেলি। তার চেয়ে আমি বরং আত্মহত্যা করার কথা ভাববো। ভারতেই আমার যাত্রারম্ভ, ভারতই গন্তব্যস্থল।

ভারত যদি পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় তা থাকুক, আমি তাতে নেই।'

ভগিনী নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন সে ইতিহাস অনুধাবন করাতে আনন্দ আছে। সেই আগে, 1905 সালের 21 ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর ভাষণে এমন এক মন্তব্য করেন যাতে ভারতবাসীর মনে আঘাত লাগে। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্যের লোকেরা সত্যবাদিতায় যেমন আগ্রহী প্রাচ্যবাসীরা তেমন নয়। অকুস্থলে অবশ্য কেউ, ভারতীয়দের চরিত্রের উপর বিনা কারণে যে কটাক্ষ করা হলো, তার প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু যে নেতৃস্থানীয়েরা সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা পরে সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নিবেদিতাও তাতে যোগ দেন। পরদিন তিনি পত্রিকায় লর্ড কার্জনের বই *Problems of the Far East* থেকে একটা উদ্ধৃতি প্রকাশ করে দেখান যে কোরিয়া ভ্রমণকালে লর্ড কার্জন সে দেশের পররাষ্ট্র দফতরের অধ্যক্ষের মনে এ ধারণা জন্মিয়েছিলেন যে তিনি বিবাহসূত্রে ইংলণ্ডের রানীর সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন—যদিও এ কথার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এই লোকই আবার মিথ্যা-বাদিতা ভারতীয় চরিত্রের একটা দিক, এ অভিযোগ এনেছেন। তিনি নিজেই যে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়াতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ কিন্তু জানতে পারেনি এ কথা প্রকাশ হওয়ার মূলে কে। যে অল্প কয়জন লোক তা জানতেন ডক্টর জে. সি. বসু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি নিবেদিতাকে এক চিঠিতে লেখেন যে নিবেদিতা হলেন ঘণকৃষ্ণ মেঘান্তরালে বজ্রের মতো। ভগিনী নিবেদিতা এ বিষয়ের আলোচনা আরও চালিয়ে যান: ষ্টেটসম্যান সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে তিনি ম্যাক্সমূলারের বই *What India has to Teach Us*-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লেখ করেন। সে অধ্যায়ে 'হিন্দুদের সত্য সন্ধ চরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। সেই সঙ্গে তিনি যে সব ছাত্র লর্ড কার্জনের ওরকম অপমানজনক মন্তব্য করার কালে উপস্থিত ছিল অথচ কোনো ভাবেই প্রতিবাদ করেনি, তাদেরও তীব্র নিন্দা করেন। *Problems of the Far East* নামক বইটির যেখানটায় লর্ড কার্জন সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য জানা যায়, বইটির পরবর্তী সংস্করণ থেকে তা

বাদ দেওয়া হয়। ভারতীয় চরিত্রে লর্ড কার্জন কর্তৃক কলঙ্ক লেপনের প্রতিবাদে 1905 সালের মার্চ মাসে কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। এর অল্পদিন পরই নিবেদিতা মেনিনজাইটিস রোগে গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। আরোগ্যলাভের পর তিনি বসু পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং-এ বায়ু পরিবর্তনে যান এবং 3 জুলাই ফিরে আসেন।

এরপরই সে ঘটনাটি ঘটে যাতে ভারতের ইতিহাসের গতি বদলে যায়; সে ঘটনার ফলেই নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়েন। 20 জুলাই তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করেন, তাতে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 7 আগষ্টে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, নিবেদিতা তাতে যোগ দেন। পরবর্তী এক সভাতে বঙ্গ বিভাগবিরোধী আন্দোলনের সর্বাগ্রগণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় Federation Hall বা মিলন-মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করেন যা হবে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাংলার ঐক্যের প্রতীক। *A Nation in Making* নামক আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে 'নিবেদিতা ছিলেন এক পরোপকারী মহিলা; তিনি ভারতেরই কাজে জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করেন' এবং তিনি মিলন-মন্দির গঠনের প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। নিবেদিতা স্বদেশী ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনও সমর্থন করেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য এ কয়েকটি কথায়: স্বদেশী আন্দোলনে মনুষ্যত্বের ও স্বাবলম্বনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এখানে নেই কোনো সাহায্য যাঞ্চা, নেই কারু কাছে কোনো অনুকম্পা পাবার জন্য অনুনয়-বিনয়। এমন একটা সময় আসছে যখন ভারতে যে লোক বিদেশীদের কাছ থেকে জিনিষ কেনে সে আজকের গোহত্যাকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। কারণ, এ সুনিশ্চিত যে নৈতিক দিক দিয়ে এ দুই অপরাধ সমান। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের শপথ রক্ষার মতো ব্যাপারেই ভারতীয় জনগণ তাদের প্রকৃত চরিত্রবত্তা প্রদর্শনের সুযোগ বিশেষভাবে পেতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট পাল্টা আক্রমণ করলেন কতগুলো সার্কুলার জারী করে। তাদের মধ্যে একটাতে 'বন্দেমাতরম' গান গাওয়া ও 'বন্দেমাতরম' আওয়াজ তোলা নিষিদ্ধ করা হলো। বঙ্গবিভাগ 16 অক্টোবর তারিখে কার্যকরী হয়। 'কংগ্রেস সে দিনটি জাতীয় শোকদিবস রূপে পালন

করে ; মিলন-মন্দিরের ভিত্তিও সেদিন প্রবীণ নেতা আনন্দ মোহন বসু কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি সেদিন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। ভগিনী নিবেদিতা এসব কর্মোদ্যমের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি গোখেলের নিমন্ত্রণক্রমে অধিবেশনে যোগদান করেন। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং বিলাতীবর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে নেন। তাদের এই কৃতিত্বকে নিবেদিতা সানন্দ অভিনন্দন জানান। কংগ্রেসে গোখেল নরম পন্থী নীতির পক্ষে তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে নিবেদিতা গোখেলের প্রশংসা করেন এই বলে যে, তিনি ইংলণ্ডকে ন্যায় বুদ্ধিতে প্রণোদিত করছেন এবং তা করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই দেশের উপকার করছেন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হয় 1906 সালে কলকাতায় ; নিবেদিতা তাতেও যোগ দেন, কিন্তু চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে যে বিবাদ বেড়ে চলেছিল তাতে তিনি ব্যথিত হন। ভারতীয় জাতীয়তা যাতে গড়ে ওঠে তারই জন্য তিনি আগ্রহান্বিতা ছিলেন ; সে কারণে নানা পার্টির উদ্ভবে তাঁর বিরাগ ছিল। এ কারণে তিনি জাতীয় পতাকার একটি নকশা তৈরী করেন, তার মধ্যে প্রতীক স্বরূপ ছিল বজ্র এবং উপরে অঙ্কিত ছিল 'বন্দেমাতরম' কথাটি। তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন দধীচির কাহিনী থেকে : কাহিনীতে আছে যে দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য তাঁর দেহের অস্থি দান করেছিলেন ; বজ্রকে নিবেদিতা ত্যাগের প্রেরণার প্রতীকস্বরূপ মনে করতেন। নকশাটির অন্য কয়েকটি রূপও তিনি প্রস্তুত করিয়েছিলেন। নকশাটি সবাই অনুমোদন করেন, কিন্তু পতাকার চূড়ান্ত রূপ স্থির করার সময়ে কেউ তা বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। তাতে কিন্তু সে বিষয়ে নিবেদিতা যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তার তাৎপর্যের লাঘব হয় না।

1906 সালে বরিশাল সম্মেলনে নেতৃস্থানীয়েরা সবাই সমবেত হয়েছিলেন ; বিদেশী শাসকেরা সে সম্মেলন নিছক বলপ্রয়োগে ভেঙ্গে দেন ; তাতে রাজনৈতিক আন্দোলন আরও জোরদার হয়। 1907 সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ; চরমপন্থীরা কংগ্রেস দখল করে। অরবিন্দ ঘোষ জাতীয়তাবাদীদের

নেতৃত্ব লাভ করেন এবং 'বন্দেমাতরম' নামক ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদনায় বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে যোগ দেন। এই সময়ে গুপ্ত সমিতিদের মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠছিল এবং অরবিন্দের কাছ থেকেই সে আন্দোলন প্রেরণা পাচ্ছিল। ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী দেশীয়া জীবনীকার মাদাম লিজেল রেমণ্ড লিখেছেন যে, নিবেদিতা এসব সমিতির সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন যে তিনি তরুণ বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর কাজে সাহায্য করার জন্য ডক্টর জে. সি. বসু এবং রসায়ণশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক ও মহান সমাজসেবী ডক্টর পি. সি. রায়ের সহকারী সেজে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেবোরেটরীতে প্রবেশাধিকার পাবার ব্যবস্থা করে দেন। মাদাম রেমণ্ড আরও লিখেছেন যে মুরারীপুকুর কারখানার সঙ্গেও নিবেদিতা সংশ্লিষ্টা ছিলেন। সেখানেও বোমা প্রস্তুত হতো এবং তারই ফলে একদল বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হন ও কারাদণ্ড লাভ করেন। নিবেদিতা বাস্তবিকই গুপ্ত আন্দোলনে এতটা মিশেছিলেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহে যেমন উদ্দীপ্তা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর স্বভাব ছিল এমন—যা বিশ্বাস করতেন তার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতেন এবং তিনি স্বামীজীর শিক্ষা ও কালী উপাসনা থেকে শক্তি সাধনায় দীক্ষিতা হয়েছিলেন, এসব বিবেচনা করলে এটাই সম্ভব মনে হয় যে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব তাই করেছিলেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁর গতিবিধির উপর গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং তাঁর চিঠিপত্র খুলে পড়তেন—কিছুদিন পর তিনি পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে এ বিষয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই সে খবর জানা যায়। ভারতকে তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা, উত্তরাধিকার ও তার অতীত গৌরবানুযায়ী গড়ে তোলার চিন্তাই তাঁর হৃদয় মন ভেসে গিয়েছিল। তাঁর গুরু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে তাঁর দেশের মানুষের মাংসপেশী হোক লোহার মতো, তাদের স্নায়ু হোক ইস্পাতের মতো। মানুষ গড়াই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। সে জীবনদর্শন বিপ্লবীদের এতটা প্রেরণা দিয়েছিল যে গীতা ও চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর গ্রন্থাবলীও ছিল তাদের সবসময়ের সাথী। বিদেশী গভর্ণমেণ্টও মনে করতেন যে তিনি ও তাঁর বই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভগিনী নিবেদিতা মনে করতেন

যে জাতি গঠনেই মানুষ গড়ার পূর্ণতা। 1903 সালের 3 এপ্রিল মিস. ম্যাকলিওডের কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয় করেছিলেন, ভারতীয় জাতিকে তা থেকে প্রেরণা নিতে হবে এবং তার জাতীয়তাকে গভীর ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের যে অবনতি ঘটেছে, তা তাঁর গোচরে ছিল ; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে গোঁড়ামীতে বা বিদেশী ভাবধারা গ্রহণে এ অবনতির প্রতিকার হবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের নিজেকে নূতন করে গড়বার মতো শক্তি তার নিজের মধ্যেই আছে। তা যে আছে তা বোঝা যায় এ থেকে যে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক জীবন স্রোতের বাইরেও নানা জীবনধারা রয়েছে। তিনি মনশ্চক্ষে দেখলেন যে, ভারতের পুনরুজ্জীবনের নানা দিক থাকবে—সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক—এবং ভারতের জীবনের অন্তরস্থিত যে গভীর স্বত্তা তা দিয়েই তার বিচিত্র জীবনধারা সমৃদ্ধ হবে। তিনি তাঁর বক্তৃতা লেখা ও কাজ দিয়ে এই পুনরুজ্জীবনেরই সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। ফল হলো যেমন সুদূরপ্রসারী তেমনই স্থায়ী।

সম্মুখপথে

1905 সালে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর নিবেদিতা কিছুকাল সেখানে থাকেন ; তিন বৎসর আগে সেখানে ক্ষুদ্র আকারের একটা সেবাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল, নিবেদিতা এ সময়টা সেখানে কাজ করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গের সবাই পরে রাজস্থান যান, অনেক দিন ধ'রেই তিনি সেখানে যেতে চাইছিলেন। জায়গাটার সঙ্গে যে সব ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সে সব তাঁকে খুব বিচলিত করেছিল। একদিন তাঁরা যখন চিতোর পৌঁছুলেন তখন রাত দুপুর পেরিয়ে গেছে, চারদিক চন্দ্রালোকিত। মাইল খানেক দূরে চিতোর দুর্গ দেখা যাচ্ছিল, তাঁরা একটা পাথরের উপর বসলেন এবং নিবেদিতা অতীত ও চিতোরের গৌরব পদ্মিনীর ধ্যানে ডু'বে গেলেন। তারপর তাঁরা বারাণসী ফিরলেন, সেখানে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লো অ্যানি বেসান্ত ছিলেন থিওসফী মতের অনুসারী কিন্তু সেই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তিনিও এ দেশকে নিজের ব'লে গ্রহণ করেছিলেন এবং কালক্রমে দেশের সর্বাগ্রগণ্য নেতাদের অন্যতম ব'লে পরিগণিতা হন। নিবেদিতা এখানে জনসমক্ষে কয়েকটি ভাষণও দেন।

তারপর তাঁরা 1906 সালের 22 জানুয়ারী কলকাতা ফিরে আসেন। সে বছরেই এমন দু'জন লোক মারা যান নিবেদিতা যাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছিলেন। তাঁদের একজন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ, তিনি নিবেদিতাকে হিন্দু ধর্ম বুঝতে সাহায্য ক'রেছিলেন। অন্যজন ছিলেন ভক্তিভাজনা বর্ষিয়সী গোপালের মা ; তাঁকে এই নামেই ডাকা হ'তো কারণ, স্বয়ং রামকৃষ্ণ তাঁকে মা ব'লে ডেকেছিলেন। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলিওড তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন বেলুড়ে একটা

উৎসবে, তারপর আবার 1898 সালে কামারহাটিতে, তাঁর ঋষিকল্প চরিত্র তাঁদের মুগ্ধ ক'রেছিলো। 1903 সালের 10 ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আড়াই বৎসর কাল তিনি নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন, 1906 সালের 6 জুলাই তিরানব্বই বৎসর বয়সে গোপালের মা দেহত্যাগ করেন। এ সব মৃত্যুতে নিবেদিতার জীবনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হ'লো। পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ ঘটতে আরেক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নিবেদিতা উদ্ধার কার্যের ব্রত নিয়ে সেখানে যান। *Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906* নামক বইয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। কলকাতা ফিরে তিনি পীড়িত হ'য়ে পড়েন ; ভগিনী ক্রীশ্চিন এবং বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাঁর পরিচর্যা করেন। আরোগ্যকালে তিনি দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে গিয়ে থাকেন। কিছু লেখার কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে তাঁর অবস্থানকাল বাড়িয়ে দেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সাময়িক প্রসঙ্গ লেখা ছাড়াও তিনি *Cradle Tales of Hinduism* ও *The Master as I saw him* বই দুটো লেখা শুরু করেন। তিনি জে. সি. বসুকে তাঁর বই *Plant Response* ও *Comparative Electro-Psychology* রচনায় সাহায্য করেন। মিসেস সেভিয়ার্স 1907 সালে কলকাতায় আসেন, নিবেদিতার সঙ্গে দমদমে অবস্থান করেন এবং স্বামী স্বরূপানন্দকৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদের প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেন। নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন উভয়েই ডাঃ ও মিসেস বসুর সঙ্গে মায়াবতী যান। সে সময়ে মায়াবতী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বামী বিরজানন্দ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন, স্বামী স্বরূপানন্দ তা প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা রচনাবলীর একটি উপক্রমণিকা লেখার ভার নেন। তার নাম দেন *Our Master and His Message.* এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল এবং মিস ম্যাকলিওড ও মিসেস বুল তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পাশ্চাত্যে যেতে পীড়াপীড়ি করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবেশও প্রীতিকর ছিলনা ; গভর্নমেন্ট কঠোর অত্যাচারের নীতি চালাচ্ছিলেন। লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের সংবাদে নিবেদিতা স্তম্ভিত হন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ও 'যুগান্তর'

পত্রিকার সহ-সম্পাদক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হওয়াতে নিবেদিতা তাঁকে জামীনে মুক্ত ক'রে আনেন, কিন্তু পরে ডক্টর দত্ত এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমেরিকা চ'লে যান। ইতিমধ্যে ডক্টর জে. সি. বসু'র বই *Plant Response* ও *Comparative Electro-Psychology*-তে বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল এবং তিনি য়ুরোপে নিমন্ত্রিত হন। তিনি নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। সে অনুসারে নিবেদিতা *Modern Review* ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা দু'টির জন্য আগাম কিছু লেখা প্রস্তুত করেন, মা সারদামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যান, তারপর য়ুরোপ রওনা হন। তিনি জাহাজে ব'সেও তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। ক্রীশ্চিনের এক চিঠিতে তিনি জানতে পারেন যে, বালিকা বিদ্যালয় আবার খোলা হয়েছে ও ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ; এ সংবাদে তিনি উল্লসিত হ'ন।

পাঁচ বৎসর পর তিনি মা, বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন ; 1907 সালের সেপ্টেম্বর থেকে কয়েক সপ্তাহ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। নিবেদিতা যে হিন্দুদের জীবন পদ্ধতি নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মা মেরী তা খুব ভালো হয়েছে বলে মনে করেন ও এতে নিবেদিতাও সান্ত্বনা বোধ করেন। নভেম্বরে তিনি য়ুরোপ যান, বসু পরিবারের সঙ্গে জার্মানীতে এবং মিস ম্যাকলিওড ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে প্যারীতে দেখা করেন। তাঁর বই *Cradle Tales of Hinduism* এই সময়ে প্রকাশিত হয় ও সাফল্য লাভ করে। তাঁর ইংলণ্ড প্রবাসকাল ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, লেখা ও আলাপে কেটে যায়। 1908 সালে তাঁর প্রিন্স ক্রোপটকিনের সঙ্গে পুনরায় দেখা হয় ; প্রিন্স ক্রোপটকিন তাঁকে বলেন যে রাশিয়া ও ভারতের অবস্থায় মিল রয়েছে এবং দু' দেশেই সমাজ বিপ্লব ঘটতে পারে বলে আশা দেন। গোখেল, বি. সি. পাল, আর. সি. দত্ত, আনন্দ কুমারস্বামী এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ভারতীয়—তা ছাড়া র‍্যাটক্লিফ ও কলকাতা শিল্পকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেল এ সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের সবার সঙ্গে দেখা করলেন, ভারতের হিতার্থে তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল পার্লামেণ্ট সদস্য ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি দেখা

করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার হেনরী কটন, ডক্টর ডি. এইচ. রাদারফোর্ড, মিসেস কেয়ার হার্ডি, উইলিয়ম রেডমণ্ড ও *Review of Reviews* পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম. স্টেড। ভারতের কাজে নিবেদিতার কোনো ক্লান্তি ছিল না।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতে রাজনৈতিক উত্তেজনা উচ্চমাত্রায় পৌঁছেছিল। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ভেদ সম্পূর্ণ হলো। বিপ্লবীদের বলপ্রয়োগ ও গভর্নমেন্টের অত্যাচার উভয়ই বেড়ে চলছিল। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসুর কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, ঘটনাক্রমে দু'জন য়ুরোপীয় মহিলার মৃত্যু, বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার এ্যানড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের প্রয়াস, আলীপুর জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীর হত্যা, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের গ্রেপ্তার, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আরও আটজনের নির্বাসন—এ সব ঘটনার সংবাদ নিবেদিতাকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু বিদেশে তাঁর আরও কাজ ছিল এবং তিনি ডক্টর জে. সি. বসুর সঙ্গে এক মাসের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডে যান। তারপর তাঁরা আমেরিকায় যান এবং বোস্টনে মিসেস ওল বুলের সঙ্গে অবস্থান করেন। নিবেদিতা মেইন নামক স্থানে গ্রীন একারে যৌথসম্প্রদায় নামে বিদিত এক লোকসমষ্টির সঙ্গে দেখা করেন ; স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে মিস সারা জে. ফার্মারের নিমন্ত্রণক্রমে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। বিবেকানন্দ সেখানে ধ্যানধারণায় ও শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথনে দিন কাটান। নিবেদিতার বোধ হলো যে সেখানকার আবহাওয়া স্বামীজীর অবস্থিতিতে পূত হ'য়ে আছে। সেখানে তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। মিস ম্যাকলিওড ও মিসেস লেগেটের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটে। 1907 সালের নভেম্বরে তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য বহুবিস্তৃত সফর করেন। তিনি তাঁর স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহও করেন। ন্যু ইয়র্কে তিনি প্রখ্যাতা গায়িকা মিস এমা থাসবির সঙ্গে কয়েকদিন কাটান। সে সময়কার সুপরিচিত সাংবাদিক এফ. আই. আলেকজান্দার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। নিবেদিতা তাঁর মনে যে বিরাট ছাপ রেখেছিলেন তিনি তার বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। ন্যু ইয়র্কেও তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার তাদের প্রভাব সম্বন্ধে একাধিক বক্তৃতা দেন। জি. টি. সাদারল্যাণ্ডের

সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। মার্কিন সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে সাদারল্যাণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবী জোর সমর্থন করেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। ডক্টর তারকনাথ দাস ও ডক্টর দত্ত স্বীকার করেছেন যে নিবেদিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, তা হলো স্বামীজীর চিঠিগুলি সংগ্রহ করা। এ সময়ে ডক্টর জে. সি. বসু মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছিলেন, নিবেদিতার পরিকল্পনা ছিল তাঁর সঙ্গে দেশে ফেরা। কিন্তু তিনি সংবাদ পেলেন যে তাঁর মা ক্যানসারে পীড়িত এবং অতীব যন্ত্রণাভোগ করছেন। নিবেদিতা তাঁর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন। তাতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূত জীবন থেকে প্রেরণা দিয়ে যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা করলেন। 1909 সালের 9 জানুয়ারী তিনি আমেরিকা থেকে এসে মাতার শয্যাপার্শ্বে পৌঁছান। তাঁর মা তাঁকে কাছে পেয়ে আনন্দিতা হন এবং 26শে জানুয়ারী শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। নিবেদিতা আরও কিছুদিন তাঁর ভাই ও বোনের সঙ্গে থাকেন। তিনি মাকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর বাবা গীর্জাতে যে সব ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন সে সব আবার লিখে সাজাবেন এবং সে কথা রক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মিঃ ষ্টার্ডিকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তিনি সে সবও সংগ্রহ করেন। এপ্রিল মাসে তিনি ভাই ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর মাতার দেহের ভস্মাবশেষ আয়র্ল্যাণ্ডস্থ গ্রেট টরিংটন নামক স্থানে বহন করে নিয়ে যান এবং তাঁর পিতার দেহাবশেষের পাশে সমাধিস্থ করেন। তাঁর পিতার শেষকৃত্যকালে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকেন। তাঁর পিতামাতা যে পৈতৃক বাসস্থানে ও প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে একত্র শায়িত হলেন এতে নিবেদিতা মিসেস বুলের কাছে এক চিঠিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা এবার ভারতে ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বসু দম্পতি মার্চ মাসে ইংলণ্ডে ফেরেন এবং মে মাসে ইউরোপ যান। মিস ম্যাকলিওড, মিসেস বুল এবং নিবেদিতা তাদের অনুগামী হন। 1909 সালের 2 জুলাই তাঁরা জাহাজে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সে তারিখেই লণ্ডনে স্যার কার্জন উইলী নামক ইণ্ডিয়া অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনৈক ভারতীয় কর্তৃক নিহত হন; এ সংবাদ

পেয়ে নিবেদিতা বিচলিত হয়ে পড়েন। 1909 সালের 18 জুলাই তিনি কলকাতা পৌঁছান। তাঁর জীবনীকারদের অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত যে এ সময়ে তিনি নিজেকে কিছুকাল কতকটা গোপন রেখেছিলেন; কারণ ইংরাজ গভর্নমেণ্টের পুলিশের চোখে তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি। কাজেই তিনি বুঝেসুঝে আবার তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করেন। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি আরও প্রকাশ্য অংশ গ্রহণ করেন, এই ছিল তাঁর নিয়তি।

'বহি তব কর্মভার'

এ সময়টাতেই আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছিলেন। সর্বত্র খানাতল্লাস ও গ্রেফতার চলছিল। বিপ্লবীরা বোমা তৈরী করে ও বোমা মেরে জবাব দিচ্ছিলেন। তথাকথিত মুরারীপুকুর রোড ষড়যন্ত্র 1908 সালের মে মাসে ধরা পড়ে। মামলা চলে দেড় বৎসর ধরে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তার ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দের কাছে থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন, পনেরো বৎসর বয়সে বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন এবং দেশের যুব সংগঠনে নিবেদিতার সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি এবং উল্লাস কর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, আপীলে তা কমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আর তেরো জন কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চিত্তরঞ্জন দাশের জোরালো পক্ষ সমর্থনের ফলে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। ভগিনী নিবেদিতা ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর বন্ধুদের অনেকেই বিনা বিচারে আটক, কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত। তিলক তাঁদের অন্যতম। তাঁকে ছয় বৎসরের জন্য মান্দালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অন্যান্য কয়েকজন বাংলা থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। অন্য অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন, কেউ কেউ আত্মগোপন করেছেন। নেতার অভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছিল। দেবব্রত ও শচীন নামে দু'জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা বেলুড় মঠে যোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে মঠের উপর পুলিশের কড়া নজর বসে। মঠের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে বাইরের লোকের আসা নিষিদ্ধ করে দেন—নিবেদিতা কলকাতা ফিরলে পর ব্রহ্মানন্দ আগে যেমন একবার তাঁর কার্যকলাপের জন্য দায়িত্ব অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেই মর্মে এবার দ্বিতীয় বিবৃতি দেন। মোকদ্দমায় অরবিন্দ

খালাস পাওয়াতে নিবেদিতা তাঁর স্কুলে উৎসব পালন করেন। এই সময়ে বোধ হচ্ছিল যেন শ্রীঅরবিন্দ পূর্বাপেক্ষা বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি সংগ্রহ করেছেন ; তিনি গীতা ও উপনিষদের সাহায্যে যে যোগীসুলভ মনঃসংযোগের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে নিজেও লিখলেন। তিনি দাবী করলেন যে জেলে থাকা কালে এক পক্ষ কাল তিনি বিবেকানন্দের স্বর শুনেছেন ও তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছেন। এই সময়ে তিনি দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন—ইংরাজীতে *Karmayogin* ও বাংলায় 'ধর্ম'। জাতীয় সাধনাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্মিলিত করাই তিনি এ পত্রিকাদ্বয়ের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করলেন। নিবেদিতা এ দুই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। অরবিন্দ স্বীকার করতেন যে দক্ষিনেশ্বরের নিরক্ষর ঋষি রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই ভারত আত্মোদ্ধারের পথ জেনেছে। তিনি এ কথার উপর জোর দিতেন যে, কাজ তখনও ভালো করে শুরুই হয়নি, বিবেকানন্দের বাণীও তখন বাস্তবায়িত হয়নি। নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন, অরবিন্দ নিজেকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রাচীন ঋষিদের পন্থানুসরণে আত্মিক শক্তি সংগ্রহ করার দিকে যেতে চাইছেন। তিনি ইংরাজী 'কর্মযোগিন' এর 39টি সংখ্যা প্রকাশ করার পর খবর এলো যে গভর্ণমেণ্ট তাঁর ও তাঁর পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের কথা ভাবছেন। যে রাজনৈতিক কর্মীমণ্ডলী সে সময়ে অরবিন্দকে ঘিরে থাকতো নিবেদিতা অনেক সময়েই তাঁদের সান্নিধ্যে আসতেন। অরবিন্দ নির্বাসিত হবেন বলে একটা খবর আসাতে নিবেদিতা তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অরবিন্দ 'কর্মযোগিন'-এ একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেটা জাতির উদ্দেশে তাঁর ইচ্ছাপত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং তাতেই তখনকার মতো নির্বাসন এড়ানো যায়। কিন্তু তার অল্পদিন পরই 'কর্মযোগিন'-এর কর্মী রামচন্দ্র মজুমদার খবর আনেন যে অরবিন্দের গ্রেপ্তার আসন্ন। তখন আর মোটেও সময় ছিল না। 1910 সালের ফেব্রুয়ারীতে অরবিন্দ ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে চলে যান। তিনি নিবেদিতার জন্য এক বার্ত্তা রেখে যান, তাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে নিবেদিতাকে 'কর্মযোগিন' সম্পাদনার ভার নিতে বলেন। নিবেদিতা 14 ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দননগরে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেদিন ছিল সরস্বতী পূজার

দিন। সে মাসের সাতাশ তারিখে নিবেদিতা পুনরায় অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। 1910 সালের এপ্রিলে 'কর্মযোগিন' বন্ধ হয়ে যায়, সে পর্যন্ত নিবেদিতা কাগজটি সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন। ততদিনে অরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌঁছে গেছেন।

এই সময়ে পত্রিকাটির এক সংখ্যায় নিবেদিতা এক বিবৃতি প্রকাশ করেন ; সেটাও একটি ইচ্ছাপত্ররূপে গণ্য হয়েছে। সেটি এরূপ ঃ

> আমি বিশ্বাস করি যে ভারত এক, অবিভাজ্য, অজেয়।
>
> এক বাসভূমি, এক স্বার্থ ও এক দেশপ্রেমের উপরই জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে।
>
> আমি বিশ্বাস করি যে বেদ ও উপনিষদের মধ্য দিয়ে, নানা ধর্ম ও সাম্রাজ্য গঠনে, বিদ্বজ্জনের বিদ্যায় ও ঋষিদের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তা পুনরায় আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, তার নাম জাতীয়তা।
>
> আমি বিশ্বাস করি যে অতীতের মধ্যেই বর্তমান ভারতের শিকড় গভীরভাবে নিহিত এবং তার সামনে রয়েছে গৌরবময় ভবিষ্যৎ।
>
> হে জাতীয়তা! তুমি এসো আমার কাছে আনন্দে, এসো দুঃখে, এসো সম্মানে বা এসো লজ্জায়। তুমি আমাকে তোমার আপন করে নাও!

এর আগেই নিবেদিতার উপর সর্বদা পুলিশের নজর লেগেছিলো, তাঁর সাধারণ চিঠিপত্রও সেন্সর করা হতো, সেকারণে তাঁকে বাধ্য হয়েই পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হয়েছিলো। 10 মার্চ তারিখে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির স্ত্রী লেডী মিন্টো নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে নিবেদিতার স্কুল দেখতে আসেন। চলে যাবার আগে তিনি নিজের পরিচয় দেন, তাঁর আসাতে নিবেদিতা একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত হন। লেডী মিন্টো পরে লেখেন, নিবেদিতা তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিলেন। তিনি বেলুড় মঠেও যান। দক্ষিনেশ্বরে যাবার সময়ে নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন তাঁর সঙ্গে থাকেন। তিনি নিবেদিতাকে রাজভবনে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন এবং নিবেদিতার উপর পুলিশের নজরের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি নিবেদিতাকে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন, নিবেদিতা তাই করেন।

এসব ঘটনার আগে 1909 সালের নভেম্বরে ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের নেতা ও ভাবী প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড কলকাতা আসেন ও নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন। তিনিও নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেন।

যাহোক, 'কর্মযোগিন'-এর প্রকাশ স্থগিত হ'য়ে যাবার পর নিবেদিতা চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন। তিনি যে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা ছিল তাঁর ভারতের জীবনপ্রবাহে নিজেকে মিলিয়ে দেবারই ফল। এখন তিনি তাঁর প্রয়াত গুরুর বাণীর নির্দেশে সে জীবনপ্রবাহে গভীরভাবে ডুবে যেতে চাইলেন। তিনি আর যা কিছু করুন বা করতে চেষ্টা করুন না কেন, স্কুলের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রথম চিন্তা। তিনি স্কুল ও স্কুলের ছাত্রীদের ভালোবাসতেন ও তাদের যত্ন নিতেন। ভগিনী ক্রীশ্চিনা তাঁর অনুপস্থিতে স্কুলটির পরিচালনা করেছিলেন। নিবেদিতা পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য চলে যান এবং নিবেদিতা স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। পুষ্পদেবী নামে একজন শিক্ষিকা কিছুদিন এ স্কুলে ছিলেন। বিপ্লবী দেবব্রতর ভগিনী সুধীরা স্কুলের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দেবব্রত বেলুড় মঠে যোগ দিয়েছিলেন সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্কুল পরিচালনায় ভগিনী নিবেদিতার প্রধান অসুবিধাই ছিল আর্থিক। তিনি মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়ার কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্য পেতেন ; কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। ইতিমধ্যে স্কুলটির দুটী শাখা খোলা হয়েছিল। এই সময়ে স্কুলে সত্তর জনের মতো ছাত্রী ছিল। নিবেদিতা তাদের ভূগোল, ইতিহাস, সূঁচের কাজ ও অঙ্কনবিদ্যা শেখাতেন। তিনি নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন ; তিনি যে ছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে ব্যক্তিগত নজর রাখতেন, তা তাঁর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল। তিনি তাঁর ছাত্রীদের তৈয়ারী খেলনা ও ছবি লোককে দেখাবার জন্য সাজিয়ে রাখতেন ; প্রসিদ্ধ শিল্পরসিক আনন্দ কুমার-স্বামী একদিন স্কুল দেখতে এসে একটি ছাত্রীর করা আলপনার নকশার প্রশংসা করেন, এতে নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হন। সংস্কৃত শিক্ষাকে স্কুলের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবেন এরকম পরিকল্পনায় ও ছাত্রীরা তালপাতায় সংস্কৃত লিখবে এমন সম্ভাবনায় তিনি উল্লাস বোধ করতেন। ছাত্রীদের ধার্মিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান-গুলোতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলে তাঁর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি কিন্তু তিনি তাদের যাদুঘরে, চিড়িয়াখানায়, দক্ষিণেশ্বরে ও সে জাতীয় অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা

করেছিলেন। সে সব জায়গার তাৎপর্য তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতেন, তা'তে তাদের বেড়াবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতো। সর্বদাই তাঁর চেষ্টা ছিল ছাত্রীদের স্বদেশ ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করা। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের গ্রীয়ার পার্কে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা হতো; তিনি ছাত্রীদের তা শোনাবার জন্য সেখানে নিয়ে যেতেন। তিনি স্বদেশী প্রদর্শনীগুলিতে ছাত্রীদের হস্তশিল্পের নিদর্শনসমূহ দেখাবার ব্যবস্থা করতেন, স্কুলে চরকায় তাঁত বুনবার ক্লাশও খুলেছিলেন। 'বন্দেমাতরম' গান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্কুলে ছাত্রীদের দ্বারা তা নিয়মিতভাবে গাওয়াতেন। তিনি তাদের নিয়ে বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করতেন এবং তাদের বেলুড় মঠে ও মা সারদামণির কাছে নিয়ে যেতেন। তিনি ছাত্রীদের মধ্যে বালবিধবাদের বিশেষ যত্ন নিতেন। মোটের উপর তিনি স্কুলটিকে এমন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন যে ছাত্রীরা সেখানে শুধু শিক্ষাগ্রহণ করত না, মনের আশ্রয় ও আশ্বাসও পেতো। সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও নিবেদিতা স্কুলের কাজে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

মা সারদামণি যখনই দেশের বাড়ী থেকে কলকাতা আসতেন তখনই স্কুলটি দেখতে যেতেন। নিবেদিতাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলতেন না—বিশেষত কোথাও দূরে যাবার আগে। তিনি মা জননীকে যথোচিত অনুষ্ঠান সহকারে অভ্যর্থনা জানাতেন। মা'র প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল প্রবল ভক্তির এবং মা'রও তাঁর প্রতি স্নেহের সীমা ছিল না। নিবেদিতা তাঁর স্বস্তিবিধানের জন্য যথাসাধ্য করতেন। তিনি মা'র জন্য যা করতে চাইতেন তা সব করতে পারতেন না; কারণ, অর্থাভাব। তিনি মা সারদামণিকে মা ব'লে ডাকতেন এবং মা-ও নিবেদিতাকে মেয়ে ব'লে সম্বোধন করতেন। নিবেদিতা যখন মাঝে মাঝে দেশের বাইরে যেতেন তখন চিঠি পত্রের মধ্যেও তাদের এই মা-মেয়ে সম্পর্ক প্রকাশ পেত। নিবেদিতা মা'র সঙ্গে কথা বলার ও ছাত্রীদের পড়াবার মতো যথেষ্ট বাংলা শিখেছিলেন। ভারতের নারীর সেবা করার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবেলকে ভারতে আসতে বলেছিলেন। মা সারদামণি ছিলেন মূর্ত্তিমতী আদর্শ ভারতীয়া নারী এবং ভগিনী নিবেদিতা মা'র কাছেই তাঁর প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

সমাপ্তি

এবার ভগিনী নিবেদিতা যে ভ্রমণে নির্গতা হলেন তা'তে ভারতের অনন্ত জীবনধারা বলে যা কথিত তার সঙ্গে তাঁর একাত্মতা সম্পূর্ণ হলো। ডক্টর জে. সি. বসু, শ্রীযুক্তা অবলা বসু ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দমোহন বসু'র সঙ্গে তিনি কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণে তীর্থ-যাত্রা করলেন। তাঁরা সেখান থেকে হরিদ্বার দিয়ে ফিরলেন শ্রীনগর হয়ে। ভারতীয় জাতির তথাকথিত সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতায় প্রবল আগ্রহের অভিজ্ঞতা তিনি প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করেছিলেন। *Modern Review* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছিলেন, পরে সেটা *Kedarnath and Badrinarayan—A Pilgrim's Diary* নামক বই আকারে প্রকাশিত হয়।

সেখান থেকে ফেরার পর তিনি মিসেস সারা বুলের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পান। মিসেস বুল নিবেদিতার মহদুপকার ক'রেছিলেন: স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'বীর মাতা' বলে ডাকতেন। নিবেদিতার স্কুল চালানো, লেখা প্রকাশ করা এবং জে. সি. বসুর কাজে সাহায্য করাতে মিসেস বুলের প্রচুর সহায়তা ছিল। নিবেদিতার মনে এ সময়ে মৃত্যুর পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছিল, তিনি মিসেস বুলকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর কাজ শেষ ক'রে যেতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করছেন। এরই মধ্যে তিনি যখন অন্যান্য বৎসরের মতো পূজার ছুটিতে দার্জিলিং গিয়েছিলেন তখন টেলিগ্রাম পেলেন যে মিসেস বুলের অবস্থা সংকট-জনক এবং তিনি তাঁকে দেখতে চান। তাই নিবেদিতা জাহাজে করে তাড়াতাড়ি মিসেস বুলের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন ও অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি স্বামীজীর লেখা থেকে তাঁকে প'ড়ে শোনান এবং তিনি ও স্বামীজী যে সময়টা একসঙ্গে ভারতে ছিলেন

তার স্মৃতিচারণ করেন। এ সময়েই তিনি 'মেয়েদের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক একটি সন্দর্ভ লেখেন ও লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বজাতি সম্মেলনে প্রেরণ করেন। সে সময়ে তাঁর সমস্ত চিন্তাই ছিল মিসেস বুলকে ঘিরে। একদিন তিনি যখন মিসেস সারা-র জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করছিলেন তখন তিনি অনুভব করলেন যে কুমারী মেরীর প্রতিকৃতির সঙ্গে মা সারদামণির কোনো প্রভেদ নেই। তিনি তখনই শ্রীশ্রীমা'র কাছে একটা চিঠি লিখলেন। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি সে সময়ে খুব অশান্তিতে ছিলেন। মিসেস বুলের ভাই মিঃ ই. জি. থর্প ও তাঁর মেয়ে ওলিয়া এ সময়ে সেখানে ছিলেন এবং ওলিয়া নিবেদিতার প্রতি বিষম বিরূপ ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠেন। তাঁর সন্দেহ হয় যে নিবেদিতা সেখানে গেছেন মিসেস বুলের টাকাপয়সা হাত করবার জন্য। মিসেস বুল 1911 সালের 18 জানুয়ারী মারা যান। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল তখনই ভারতে ফিরে আসার, কিন্তু তাঁকে থেকে যেতে হয়, কারণ, মিসেস বুল তাঁর উইলে নিবেদিতার জন্যও কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে নিবেদিতাকে খোঁজ খবর নিতে হচ্ছিল। তিনি মিস এলিস লংফেলো নামে অন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। ওলিয়া তাঁর মা'র উইল মেনে নিলেন না, নিবেদিতা স্থির করলেন যে বিষয়টি মিঃ থর্পের হাতে ফেলে রেখে আমেরিকা থেকে চলে আসবেন। এই সময়েই তিনি স্বামী সদানন্দের মৃত্যু-সংবাদে মনে গুরুতর আঘাত পান। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর থেকেই সদানন্দ নিবেদিতার একাধারে বন্ধু, সহকর্মী ও সঙ্গী ছিলেন। আমেরিকা যাবার আগে সদানন্দের পীড়িতাবস্থায় তিনিই তাঁর দেখাশোনা করতেন। ভারতে ফিরবার পথে তিনি লণ্ডনে র‍্যাটক্লিফ ও অন্যান্য বন্ধুদের এবং মিস ম্যাকলিওড ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে দেখা করেন। বন্ধুদের সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা। 1911 সালের 23 মার্চ তিনি মার্সেলিস থেকে জাহাজে রওনা হন। 7 এপ্রিল বোম্বাই পৌঁছান এবং কলকাতা ফিরে আসেন। সে সময়ে মা সারদামণি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণান্তে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়া-নন্দের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময়ে তাঁর মনে মৃত্যুর পূর্বাভাস জোরদার হচ্ছিল, এবং স্বামীজী তাঁর কাছে যে কাজ চেয়েছিলেন পাছে

তা ক'রে যেতে না পারেন সে চিন্তায় তিনি অশান্তিভোগ করছিলেন। এই সময়ে তিনি ডক্টর এবং মিসেস জে. সি. বসু ও তাঁর ভাইপো অরবিন্দ বসু'র সঙ্গে মায়াবতীতে গেলেন। ডক্টর বসুকে তিনি তাঁর নূতন বই প্রণয়নের কাজে সাহায্য করেন। ডক্টর বসু অদ্বৈত আশ্রমে এক বক্তৃতা দেন এবং নিবেদিতাও আশ্রমবাসীদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি-ভিত্তিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেন। 3 জুলাই তাঁরা কলকাতা ফিরে এলেন। ভগিনী নিবেদিতা এ সময়ে তাঁর স্কুলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অশান্তিতে ছিলেন, কারণ, মিসেস বুলের উইল বাবদ টাকা পাওয়ার আশা সফল হলো না। তিনি অবশ্য গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে অতি সহজেই টাকা পেতে পারতেন এবং লেডী মিণ্টো সে বিষয়ে তাঁকে সাহায্যও করতেন কিন্তু বিদেশী গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে টাকা নেওয়া নিবেদিতার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। বস্তুত জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আগে 'ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' গভর্নমেণ্টের কোনো সাহায্য নেয়নি। যা হোক, অল্পদিন পরেই মিঃ থর্প তাঁকে জানান যে মিসেস বুলের উইল অনুসারে তাঁর স্কুলের জন্য কিছু টাকা দেওয়া হবে। এতে নিবেদিতা বিরাট স্বস্তিলাভ করলেন। কিন্তু এসময়ে তাঁকে কয়েকটি মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যুকালে তিনি তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। তারপর সংবাদ এলো যে মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়ার হঠাৎ মৃত্যু ঘটেছে। ওলিয়া নিবেদিতার প্রতি কতকটা বীতরাগ ছিলেন; তবু তাঁর মৃত্যু সংবাদে নিবেদিতা আঘাত পেলেন। আরেক শোকাবহ ঘটনা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যু। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনুরক্ত ও আত্মোৎসৃষ্ট সহকর্মী। নিবেদিতা মাদ্রাজ ভ্রমণকালে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা নিবেদিতার মনে বিশেষ ছাপ রেখেছিলো। এ সময়ে নিবেদিতার অন্য ধরণের দুর্ভাগ্যও ঘটলো। ভগিনী ক্রীশ্চিন আমেরিকা গিয়েছিলেন, ফিরে এসে মায়াবতীতে গেলেন। নিবেদিতা সেখানে গেলে পর ক্রীশ্চিন তাঁকে বললেন যে তিনি আর তাঁর সঙ্গে থাকবেন না, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। নিবেদিতা ক্রীশ্চিনের সম্পূর্ণ গুণানুরাগিনী ছিলেন এবং লেখা ও বলায় তাঁর উচ্চ প্রশংসা করতেন। ক্রীশ্চিন এভাবে পর হয়ে যাওয়াতে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর এভাবে চলে যাওয়ার

কারণও জানা যায়নি। নিবেদিতার নিজের লেখার কাজ ছিল, ডক্টর বসুকেও সাহায্য করতে হতো ; তা স্বত্ত্বেও তিনি স্কুলের কাজে খুব খাটতে লাগলেন। আরও আঘাত পেলেন ভগিনী সুধীরা স্কুল ছেড়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়াতে, সম্ভবত ক্রীশ্চিনের প্রভাবে পড়ে সুধীরাও চলে গেলেন। নিবেদিতা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ক্রীশ্চিন বা সুধীরা কারুই আর নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হলো না, কারণ, কিছু সময় পরে যখন তাঁরা দার্জিলিংয়ে নিবেদিতা পীড়িত হয়ে পড়ার সংবাদ জানতে পারলেন এবং সেখানে যাবার ইচ্ছা করলেন, তখন আর সময় ছিল না।

দার্জিলিংয়ে যাবার আগে নিবেদিতা কারু কারু সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে গেলেন। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও তিনি দেখা করলেন ; গিরীশ সে সময়ে অসুস্থ থাকা স্বত্ত্বেও 'তপোবল' নামক একখানা নাটক লিখছিলেন। নিবেদিতা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে নাটকখানা পড়বেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গিরীশ যখন জানলেন যে দার্জিলিংয়েই নিবেদিতার মৃত্যু ঘটেছে তখন বইটি তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন। নিবেদিতা মা সারদামণির বাসস্থানে স্বামী সারদানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন মা'র সঙ্গেও দেখা করেন। তারপর তিনি বসু পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং যান। সেখানে প্রথম কয়েকদিন শান্তিতেই কাটলো। তাঁরা সুদূর সন্ধাক ফু পাহাড়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন কিন্তু যাবার দিনেই নিবেদিতা রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। সে সময়কার চিকিৎসকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ডাক্তার নীলরতন সরকার তখন দার্জিলিংয়ে ছিলেন ; কিন্তু চিকিৎসায় কোনো কাজ হলো না। তিনি আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। ইতিপূর্বে তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, মনে হলো যেন তখন তা উপলব্ধি করছেন।

> কাল রাত্রে আমার মনে হচ্ছিল যে, এই যে, জড়জগৎ-এর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে আছে, এর ভেতরে সমগ্ররূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছে অন্য এক জগৎ—তাকে বলতে পারো ধ্যানলোক, বলতে পারো মন বা তোমার ইচ্ছানুযায়ী অন্য কিছু, এবং হয়তো মৃত্যু বলতে সে জগৎকেই বোঝায়। এ স্থান-পরিবর্তন নয়, কারণ, এ জড়পদার্থ নয়, কাজেই বিশেষ স্থানে আবদ্ধও নয়। এ হলো আমরা যে দেহে আবদ্ধ আছি তারই কল্পনা থেকে ক্রমমুক্তির

অবস্থাতে গভীর হতে গভীরতররূপে নিমগ্ন হওয়া। আমরা যদি আমাদের যে সব প্রিয়জন বিগত হয়েছেন তাঁরা আমাদের কাছে আছেন এমন চিন্তা করে সান্ত্বনা পাই, তবে এ অবস্থায়ই তাঁরা আমাদেব দৈহিক সান্নিধ্যে আসেন। এবং তা আসেন এক বিরাট সত্তায় মিশে গিয়ে পূর্ণতম স্বাধীনতা ও আনন্দে মিলে গিয়ে।

তাই আমি ভেবেছিলুম যে, বিশ্বসত্তা এ ভাবেই অসীমেব সঙ্গে মিলে গেছে এবং আমরা এখানে এ দুইয়ের মধ্যেকার সীমারেখার উপরই দাঁড়িয়ে, আমরা আদিষ্ট হয়েছি উভয়ে ব্যাপ্ত যে দিব্যলোক—সসীমের মধ্যে অসীম—নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করতে। যতোই ভাবছি ততোই আমার মনে হচ্ছে যে মৃত্যু বলতে বোঝায় শুধু ধ্যানে নিমগ্ন হযে যাওয়া—যেন একটা পাথর নিজেরই সত্তার কূপে ডুবে যায়। এ শুধু হয় মৃত্যুর পূর্বেকার দীর্ঘসময়ব্যাপী নিস্তব্ধতায়—যে সময়ে মন জীবনের বিশিষ্ট ভাবনা, সে ভাবনা তার সমস্ত চিন্তা, কাজ ও অভিজ্ঞতাব অবশিষ্ট, তাতে দোদুল্যমান হযে থাকে। এ সময়েই আত্মার দেহ থেকে মুক্তি শুরু হয়, শুরু হয় নূতন জীবন।

আমি অবাক হয়ে ভাবি একটা গোটা জীবনকে প্রেমে ও আনন্দে পরিণত করা যায় কিনা; যা করলে তাকে বিরুদ্ধ অনুভূতির কণামাত্রও বিক্ষুব্ধ করবে না। তাতে সে জীবনকে অন্তিম প্রহরে এবং তারপর আরও বেশী ক'বে একটি মহৎ চিন্তায় আবৃত করে নিয়ে যাবে। তাহলে অন্তত অনন্তকালে সেই জীবন আত্মচিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং জগতে যা কিছু প্রয়োজন, যতকিছু যন্ত্রণা, তার মধ্য দিয়ে নিজেকে শান্তি ও আশীর্বাদময় এক সত্তা বলে গণ্য করবে।'

দার্জিলিং যাবার আগে নিবেদিতা একটি বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ ছাপিয়ে প্রচার করছিলেন। সেটা তখন তাঁকে শোনান হলো:

যা কিছুর শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে, তাই যেন শত্রুহীন, বাধাহীন হয়ে দুঃখকে অতিক্রম করে, প্রাণের স্ফূর্তি লাভ করে আপন আপন পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সব প্রাণী যেন শত্রুহীন, বাধাহীন হয়ে দুঃখকে অতিক্রম করে, প্রাণের স্ফূর্তি লাভ করে আপন আপনপথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

মৃদুস্বরে তিনি তাঁর প্রিয় প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন: 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোমাহমৃতং গময়। হে ভয়ঙ্কর! আমাদের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর, চিরকাল বেশী করে প্রবেশ কর! তোমার মধুর, অনুকম্পাময় মূর্তি প্রকাশ করে অজ্ঞতা থেকে আমাদের রক্ষা করো।'

অবশেষে 1911 সালের 11 অক্টোবর এলো। নিবেদিতা বললেন, সূর্যোদয় দেখার আগে তাঁর মৃত্যু হবে না। যে অজানা লোক থেকে কোনো পথিক ফিরে আসে না, তিনি যখন সেই লোক অভিমুখে যাত্রা করলেন—তখন তাঁর কক্ষ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত।

কলকাতার গণ্যমান্য নাগরিকদের অনেকেই সে সময়ে দার্জিলিংয়ে ছিলেন; তাঁরা শোকযাত্রার সঙ্গী হলেন, গিরিনিবাসের সব শ্রেণীর লোক তাতে যোগ দিল। বিকেল সোয়া বারটায় চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন মহারাজ মৃতার চিরকাল শ্রদ্ধানুরক্ত সঙ্গী ছিলেন, তিনিই শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। রাত আটটায় সব শেষ হয়ে যায়। মৃতদেহ যেখানে দাহ করা হয়, দার্জিলিংয়ের নাগরিকগণ সেখানে এক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। নিস্তব্ধতার মধ্যে সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ আছে এই বাণী:

এখানে বিশ্রামরতা ভগিনী নিবেদিতা—তিনি
তাঁর সব কিছু ভারতকে সমর্পণ করেছিলেন।

জন্ম তাঁর আয়ার্ল্যাণ্ডে, ভারতকে তিনি নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতা তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাতে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁর সত্তার শেষ কণা দিয়ে এ দেশের সেবা করে তিনি জগৎ থেকে বিদায় নিলেন এই ভরসা নিয়ে যে, তাঁর গুরুর আদেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন।

সমকালে প্রভাব

ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন যে বাড়ীতে থাকতেন তাকে 'ভগিনী-নিবাস' বলা হতো। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ডক্টর যদুনাথ সরকার ও আরও কেউ কেউ সে বাড়ী সম্বন্ধে লিখেছেন যে, নরনারী ও বালকবালিকারা দিবারাত্রির প্রায় সব সময়েই সে বাড়ীতে ভিড় করতো। সে সময়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রবিবার সকালে সেখানে সমবেত হতেন। দেখাসাক্ষাতের সেই কেন্দ্রে আসতেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা, জননেতৃবর্গ, শিল্পী ও লেখকেরা। যে সব বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল সে সব নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন, সেখান থেকেই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনেক কাজের পরিকল্পনা তৈরী হয়ে বেরুতো। সাধারণ মানুষও অনেকে নিবেদিতার কাছে যেত, অনেকে যেত নিজেদের স্বার্থে। তিনি নানাদিকে যে প্রভাব খাটাতেন তাতে স্থায়ী ফলও অনেক হয়েছিল। তিনি যে জগজীশচন্দ্র বসুকে অকৃপণ সাহায্য করেছিলেন তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একদল বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বসুকে দাবিয়ে রাখবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ এতটা দূর গিয়েছিলেন যে তাঁর বই প্রকাশিত হতে দেননি। তা যাতে চাপা দেওয়া বা চুরি করা যায় সে চেষ্টা করেছিলেন। এতে তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। নিবেদিতা তাঁর স্বদেশীয়দের একাংশের এমন আচরণে লজ্জা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কয়েকটি বই ও *Philosophical Transaction* নামক পত্রিকার জন্য একাধিক সন্দর্ভ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। সে সময়ে রোজই নিবেদিতার সঙ্গে আচার্য্য বসুর যোগাযোগ হতো। নিবেদিতা ডক্টর বসুর বই প্রকাশের জন্য মিসেস বুলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। একটা গবেষণাগার খোলা হোক, এ ইচ্ছাও তাঁর ছিল ; তিনি যদিও তা দেখে

যেতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর পরে বসু ইনস্টিটিউট খোলা হয়। এটাকে শুধু গবেষণাগার নয়, মন্দিরও বলা হতো। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধনী বক্তৃতাতে আচার্য্য বসু বলেছিলেন যে এমন কয়েকজন তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন 'যাঁদের বাস এখন নিঃশব্দ পুরীতে।' একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চায় ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি নিবেদিতার গভীর আস্থা তাঁকে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছিল। ইনস্টিটিউটের মধ্যে একটি স্মারক ঝরণা আছে; তাতে খোদিত 'মন্দিরে আলোকবাহিকা' এক নারীমূর্তি। একে প্রতিষ্ঠানটির উপর নিবেদিতার বিচরণমান আত্মার প্রতীক বলে মনে করা হয়। ভগিনী নিবেদিতা বয়সে ডক্টর বসুর চেয়ে ছোটো হওয়া সত্ত্বেও দেবদূতীর মতো তিনি তাঁর অভিভাবিকা ছিলেন। ছুটির সময়ে তিনি ডক্টর ও শ্রীযুক্তা বসুর সঙ্গে শৈলনিবাসে যেতেন এবং কলকাতায় থাকাকালে বহু সন্ধ্যা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ও কবিতা আবৃত্তিতে কাটাতেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য নিবেদিতার প্রচেষ্টা শ্রীযুক্তা বসুর খুব ভালো লেগেছিল এবং নিবেদিতাকে দিয়ে তিনি ব্রাহ্ম মহিলাদের কাছে তাঁদের ভালোলাগে এমন সব বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়াতেন। তিনি এবং জে. সি. বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু কিছুদিন নিবেদিতার স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে জে. সি. বসু খুবই শোকাহত হয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁর উইলে এক লাখ টাকা রেখে যান। শ্রীযুক্তা বসু সে টাকা দিয়ে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' নামক এক প্রতিষ্ঠানে একটি সভাগৃহ তৈরী করিয়ে নিবেদিতার নামে তার নাম রাখেন।

1937 সালে জে. সি. বসুর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে নিবেদিতার কাছে প্রয়াত বৈজ্ঞানিক যে সাহায্য পেয়েছিলেন সে বিষয়ে বলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকালেই কবি নিবেদিতাকে তাঁর কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা রাজী হননি; তিনি বলেন, শিশুকে হিন্দু আদর্শানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন, কিন্তু নিবেদিতার কথা তাঁর এত ভালোলাগে যে তিনি নিবেদিতাকে তাঁর আদর্শানুযায়ী মেয়েদের

শিক্ষাদানের জন্য নিজগৃহ ব্যবহার করতে দিতে চাইলেন। কিন্তু নিবেদিতার কাজের চাপ তখন আগে থেকে বেশী থাকাতে তিনি কবির প্রস্তাবে রাজী হ'লেন না। নিবেদিতা যখন একদল ছাত্রকে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে পাঠান তখন কবি তাঁর ছেলে রথীনকেও তাদের সঙ্গে দেন। তিনি প্রায়ই নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতেন এবং একবার তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নিবেদিতা বাংলাও যথেষ্ট শিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প 'কাবুলীওয়ালা' তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বর্তমানে বাংলাদেশ নামে অভিহিত পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত শিলাইদহে থাকতেন, নিবেদিতা একবার ডক্টর বসুর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা সেখানে যে ভাবে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মায়ের মতো মিশতেন তা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। নিবেদিতা সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞতা থেকেই কবি তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দেন। নিবেদিতার সঙ্গে কবির গভীর বন্ধুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব হয়নি। কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে তাঁর ও নিবেদিতার পথ আলাদা ; তা ছাড়া নিবেদিতার চরিত্রে এমন একটা উগ্রতা ছিল যে তাঁর সঙ্গে মতের সম্পূর্ণ মিল না থাকলে তাঁর সঙ্গে কাজ করা কঠিন হ'তো। তা হলেও কবি তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি নিবেদিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছিলেন ও তাঁর স্মৃতি থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন তা স্বীকার করেন। নিবেদিতা কবির পিতা মহর্ষির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন এবং মহর্ষির অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে পুনরায় তার সঙ্গে দেখা করেন। কবির ভাগ্নী সরলা ঘোষাল ছিলেন সাহিত্যিক, তা ছাড়াও গভীর দেশপ্রেমিক। তাঁর সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে এবং সে ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে শিল্পের পুনরুজ্জীবনে ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। কাউন্ট কোকাসু ওকাকুরা এ সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনিই নিবেদিতাকে গভীর শিল্পানুরাগে উদ্বুদ্ধ করেন। তারই কাছ থেকে তিনি বুঝতে পারেন কলকাতা শিল্পকলা বিদ্যালয়ে উৎপন্ন নিদর্শনগুলি কতো প্রাণহীন। ই. বি. হ্যাভেল ছিলেন

সে সময়ে শিল্পকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। নিবেদিতা এ সিদ্ধান্তে এলেন যে দেশের শিল্পকলাকে দেশের মধ্যেই শিকড় গাড়তে হবে, তাকে বিদেশী শিল্পকলা পদ্ধতির অনুকরণে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। দেশপ্রেম, দেশে গৌরববোধ, ভবিষ্যতে গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং শিল্পীর নিজের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা—এ সবই হবে শিল্প সৃষ্টির উৎস। তিনি দেখলেন যে, এ সবই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং লোকসংগীত, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে সেসব প্রকাশ লাভ করেছে। ই. বি. হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত বোঝালেন কেমন ক'রে শিল্পে স্বদেশ জীবনের চেতনা, অতীত ও বর্তমানের চেতনা, সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চেতনা ফুটিয়ে তুলতে হয়। তিনি প্রাশ্চাত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহের প্রতিলিপি পুনঃমুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় রেণেসাঁর শিল্পনিদর্শনও তার মধ্যে ছিল। তিনি তাদের তাৎপর্য্য বর্ণনা করে প্রবন্ধও লেখেন। ইংলণ্ডের মিস হিরিংহাস যখন এলোরা ও অজন্তার দেয়াল চিত্রগুলি নকল ক'রে নিতে এলেন তখন অবনীন্দ্রনাথের দু'জন ছাত্র নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার যাতে পাহাড়ের গায়ের সেই সব চিত্র অনুশীলন করতে অজন্তা-এলোরা যেতে পারেন নিবেদিতা সে ব্যবস্থা করলেন। বস্তুত ভারতীয় শিল্পকলা তা'তেই পুনরুজ্জীবনের দিকে মোড় নিলো। নিবেদিতারই প্রেরণায় হ্যাভেল *Indian Sculpture and Painting* নামের বই লেখেন; ভারতীয় শিল্পকলার উপর গ্রীক প্রভাব প'ড়েছিল ব'লে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল সে বইয়ে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। এর দরুণ হ্যাভেলের য়ুরোপীয় সতীর্থেরা তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্প সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী এ ক্ষেত্রে নিবেদিতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। বস্তুত এই তিনজন ও ওকাকুরা পাশ্চাত্য মনীষীদের সামনে ভারতীয় শিল্পকলার মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রেরা তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্গীয় চিত্রকলা সম্প্রদায় *(Bengal School of Art)* গঠন করেন, 1907 সালে প্রাচ্য কলা পরিষদ গঠিত হয় এবং এ ভাবে ভারতীয় শিল্পকলা নিজস্ব নূতন পথ বেছে নেয়। ভগিনী নিবেদিতা তরুণ শিল্পীদের শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্যও কাজ করেন। নন্দলাল বসু তাঁর সম্বন্ধে

লিখেছেন যে তিনি দেবদূতের ন্যায় তাঁদের পরিচালনা করতেন। অসিতকুমার হালদার স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার যে জাতীয় পুনর্জাগরণে মহৎ অবদানের কাজ করবে, এ সত্য তাঁরা নিবেদিতার কাছেই শিখেছিলেন। নিবেদিতা তরুণ শিল্পীদের সব প্রদর্শনীই দেখতে যেতেন। শেষ প্রদর্শনী তিনি দেখেন 1907 সালের ফেব্রুয়ারীতে ; সে উপলক্ষে তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রেছিলেন তা'তে এই ভবিষ্যদ্বানী করেন যে ভারতীয় শিল্পকলার সব শাখারই বিরাট ভবিষ্যত রয়েছে।

Modern Review পত্রিকার সঙ্গে জে. সি. বসু নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের অধিকাংশই সে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলো এবং তিনি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁকে অনেক প্রবন্ধ তো জোগাতেনই, কিছুদিন তাঁর হ'য়ে পত্রিকাটির সম্পাদনাও করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে সাহিত্য-ক্ষেত্রের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত করেন ; এতে দেশের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হলো।

বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে নিবেদিতার অনেক সময় মতভেদ—এমন কি তীব্র মতভেদও হ'তো। তা স্বত্তেও ভারতে ও আমেরিকায় পারস্পরিক সংযোগের ফলে তাঁরা পরস্পরের গুণানুরাগী হয়েছিলেন। বোষ্টনে ধর্মসম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীপাল বক্তৃতা দেন, নিবেদিতা তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ ভাবে সে বক্তৃতার প্রশংসা করেন। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হওয়ায় এবং শ্রীপাল তাঁর পত্রিকা *New India* প্রকাশ করার পর নিবেদিতা নিয়মিতভাবে তা'তে লিখতেন।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যখন বাংলাতে তাঁর বিরাট গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা করেন তখন নিবেদিতা তাঁকে সে কাজে সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতা মিঃ আর. সি. দত্তের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শেখেন, *The Web of Indian Life* রচনায় তাঁর কাছে সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেন এবং *Economic History of India* লিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জি. এইচ.

নটিসন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও প্রখ্যাত তামিল কবি ও দেশপ্রেমিক সুব্রহ্মণ্য ভারতী। তিনি ভারতীর পত্রিকা 'বাল ভারত'-এ লিখতেন। যদুনাথ সরকার তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং নিবেদিতা শ্রীসরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন বিদেশী কর্তৃপক্ষের তোয়াক্কা না রেখে যা ঐতিহাসিক সত্য তাই লেখেন। ঐতিহাসিক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জীও স্বীকার করে গেছেন যে তিনি নিবেদিতার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন। যে সব তরুণ ভারতীয় দেশের সেবায় ইচ্ছুক ছিল, তিনি ছিলেন তাদের গুরু। বিপ্লবী তারকনাথ দাশ তাঁর বই *Japan and Asia* নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেন। অন্য অনেকেই তাঁর কাছ থেকে বাস্তব সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। বাংলার সে সময়কার নেতৃস্থানীয় নরনারীরা একটা বিশিষ্ট মণ্ডলী রচনা করেন এবং তাঁরা সবাই ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু ও গুণানুরাগী।

মুক্তমনা য়ুরোপীয়েরা যাতে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারা বুঝতে পারেন ভগিনী নিবেদিতা সেজন্যও কাজ করেছিলেন। বস্তুত লোকসেবায় উৎসৃষ্ট তাঁর জীবন লর্ড ও লেডী মিন্টোর মতো লোকদের মনে গভীর ছাপ রেখেছিল। ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এমন আরও কেউ কেউ ছিলেন। অক্সফোর্ড থেকে উপাধিপ্রাপ্ত মনীষী ডক্টর টি. কে. চেইনি নিবেদিতার লেখা পড়ে কীভাবে লাভবান হয়েছিলেন এবং নিবেদিতা তাঁকে কীভাবে ভারতীয় চিন্তাধারা অনুশীলনে সাহায্য করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এক কথায়, নিবেদিতা যে দেশকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন তার সেবার কোনো সুযোগই ত্যাগ করেন নি। তাঁর জীবন অল্পদিন স্থায়ী ছিল, কিন্তু তা ছিল শেষ পর্যন্ত ভারতের সেবায় নিয়োজিত। উত্তরপুরুষদের জন্য তা দেশের জীবনে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এবং দেশের সেবায় বাস্তব সার্থকতা লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ভগিনী নিবেদিতার সমকালীন লোকেরা তিনি কেমন মর্য্যাদাসূচক পোষাক পরতেন ও কিভাবে চলাফেরা করতেন এবং নানা সভায় কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করতেন, তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাঁর মেজাজে যে খানিকটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ছিল, তাও তাঁরা বলে গেছেন।

সাহিত্যে অবদান

ভগিনী নিবেদিতা ভারতকে প্রগাঢ় ভাবে ভালবাসতেন, ভারতীয় চিন্তাধারাও সম্যকরূপে বুঝতেন। কাজেই তিনি যে এদেশের বিষয় অনুশীলন করে বেশ কিছু বইয়ে ও প্রবন্ধে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এ খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। শুধু যে পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে তাঁর বই ও প্রবন্ধরাজি ভারতীয় চিন্তার সমগ্র দৃশ্যপট আলোকিত করেছে তা নয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের রূপটি দেখতেও সে সব যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই *Kali the Mother* যন্ত্রণাকাতর মানুষের সামনে যে মা কালী তার কাছে ভয়ঙ্করীরূপে আবির্ভূতা হন, তাকে নিয়ে শিশুজ্ঞানে খেলা করেন এবং সে ভাবে তাকে ভালবাসায় আশ্রয় দেন, সে মা কালীর চরিত্রচিত্রণই এ বইয়ে করা হয়েছে। মা কালীর এহেন কল্পনা বেশ জটিল। কিন্তু বইটিতে তা যথেষ্ট স্পষ্ট করে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বইটি এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে এক প্রবন্ধসমষ্টি।

The Master as I saw him বইটিতে নিবেদিতা তাঁর নিজের জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব বর্ণনা করেছেন। *Confession* বা সেন্ট অগস্টাইনের স্বীকৃতি নামে যে পৃথিবী বিখ্যাত বই আছে সুদক্ষ সমালোচকেরা নিবেদিতার এই বইটির স্থান তারই সমপর্যায়ে রেখেছেন। বিবেকানন্দ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁর সূক্ষ্মতা ও মহিমা এ বইয়ে পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই বইয়েরই অনুষঙ্গী *Notes of Some Wanderings* কতগুলো স্থান পরিক্রমা সম্বন্ধে ছোট ছোট রচনা। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে হিমালয়ে ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ আর কতগুলো স্থানে ভ্রমণ করে নিবেদিতার মনে যেসব ধারণা সঞ্চিত হয়েছিল তারই স্বচ্ছ বর্ণনা আছে এ বইয়ে। নিবেদিতা

প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেসব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি স্বামীজিকে সময় থেকে সময়ান্তরে যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বইখানিতে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিবেদিতা যেসব তীর্থে গিয়েছিলেন তাদের ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ *Kedarnath and Badrinarayan—a Pilgrims Diary* বইয়ে বিবৃত করেছেন, সে বই পাঠকের মনে একান্ত আগ্রহ সৃষ্টি করে; তাঁর যাত্রাপথে যেসব মন্দির পড়েছিলো তিনি এ বইয়ে তাদের প্রাকৃতিক পটভূমি ও স্থাপত্যের দিক দিয়ে তাদের তাৎপর্যের আনন্দদায়ক বর্ণনা দিয়েছেন।

The Web of Indian Life চিরায়ত সাহিত্যরূপে স্থান লাভ করেছে। হিন্দু পরিবারের ও হিন্দুসমাজ সংগঠনের সূক্ষ্ম দিকগুলি এ বইয়ে আশ্চর্যজনক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখানো হয়েছে। তবুও মনে রাখা দরকার, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই গড়ে উঠেছিল। জাতিভেদ প্রথাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, প্রত্যেক মানুষকে তার নির্দিষ্ট জীবনধারা অনুসরণ করে চলতে হবে এবং তা না চললে তার মর্য্যাদার হানি হবে। জাতিভেদ প্রথাতে এই নীতির নিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে। সে প্রথাতে যেসব অন্যায় ঢুকেছিল এবং তার যে অপব্যবহার হচ্ছিল, নিবেদিতা তখনও তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করেননি। হিন্দু নারীদের আত্মত্যাগ, এবং বিধবারা যেভাবে তাদের অদৃষ্ট মেনে নেয়, তাদের সেই আত্মনিবেদিত জীবনধারা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। আধুনিক কালের লোকের মনে হবে যে, আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের আবরণে মেয়েদের যে দুঃখ ও অপমান সইতে হয়, নিবেদিতার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাগত অপূর্ণতা ও তার ফলে যে তাদের জীবনের সার্থকতা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, সে কথার উপর তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে আধুনিক কালের পরিস্থিতিতে নারীরা শিক্ষার অভাবের দরুণ সমাজের দাবী ও তাদের আপন সত্তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা পূর্ণ করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। তাঁর সন্দর্ভের শেষের দিকে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো লেখেন; কথা কয়টিতে তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যক্ষ হয়েছে:

নারীর জীবনে এই যে পরিবর্তন তা ঘটবে এক মহৎ অভ্যুত্থানের ফলে। পরিবর্তনই যে সে অভ্যুত্থান ঘটাবে তা নয়, এমন এক অভ্যুত্থান যা থেকে সমগ্র জাতি বেরিয়ে আসবে উজ্জলরূপে, বিজয়ীরূপে—যুগযুগ ধ'রে তা জাতির সন্তানদের ধারনা ও কল্পনাকে প্রভাবিত করতে থাকবে। কিন্তু এমন অভ্যুত্থানের যে উৎস, তা কোথায় পাওয়া যাবে ?

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু নিজেদেবেই এই আশ্বাস দিতে পারি যে, মনুষ্যজগতের যখন কোনো যুগান্তকারী মতবাদ গ্রহণেব সময় আসে তখন মানুষের প্রতীক্ষামান চেতনায় সে মতবাদ সব দিক থেকেই আঘাত কবতে থাকে। আজকেব ভারতের নিশ্চয়ই সে সময় এসেছে। পাথরগুলো পর্য্যন্ত কথা বলতে থাকে, দেয়ালেব কাঠগুলি পর্য্যন্ত চীৎকার ক'রে সাড়া দেয়। ফলে যাতে সবার মঙ্গল হবে এমন কিছুর জন্য বিবাট সংগ্রাম ঘনিয়ে আসে। যে নূতন ভাব বর্তমান এবং তাব জন্য যে সংগ্রাম এ উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে, একে অন্যকে ক্রমেই বেশী স্পষ্ট ক'বে তোলে—যতক্ষণ না উভয়েরই লক্ষ্যলাভ হয়।

এমন যে হয় তা পূর্বেব চেয়েও এখন বেশী সত্য, কারণ, এখন টেলিগ্রাফ এসেছে, এসেছে পত্রলিখনের সুযোগ, সবার বোধ্য ভাষা ও সস্তায় মুদ্রণের সুবিধা। রাজা অশোকেব সমসাময়িক ভারতে যা ঘটতে দু'শো বছর লাগতো, এখন তা এক দশকেই হওয়া সম্ভব। ইংরেজী ভাষার একটা শব্দও যেখানে পৌঁছবে সেখানেই তার মাধ্যমে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের একটা সংস্থা সৃষ্টি করবেই।

ভগিনী নিবেদিতা যখন এ কথাগুলো লিখেছিলেন তার এক দশক পরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে মহাভারতে মহাজাগরণ ঘটলো। তাই মনে হয়, তাঁর কথাগুলো কি সে জাগরণেরই পূর্বাভাষ ছিল না? কথাগুলো থেকে আরও অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই :

মেয়েদের সুসংকল্পিতভাবে সবকিছু সুসমন্বিত করার আগ্রহ থাকে। কাজেই তারাও আর বেশী দিন সব বিষয় সমগ্রভাবে বিবেচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে বাজী থাকবে না। মাতৃজাতির টান সব সময়েই ভবিষ্যতের দিকে। জাতি হিসাবে একবার পরাস্ত হ'লে পর সে যে তার পিতৃপুরুষের অধিকারবিচ্যুত হ'য়ে যায় তা মেয়েরাই চটপট বুঝতে পারে; তাই তারা সংকল্প করে যে তাদের পুত্রদের অদৃষ্টে জয়ই ঘটবে, আত্মসমর্পণ ঘটবে না। সে সংকল্প যাতে ফলপ্রসূ হয় তাও তারা করবে।

আর প্রাচ্য দেশের নারী যদি একবার এ ভাবে জাহাজের হাল ধরে তার সমগ্র দেশের সমস্যার সমাধান করে তবে আর কার কাছে তার নিজের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে যাবে?'

ভারতীয় সমাজকে নিবেদিতা যে ভাবে দেখেছিলেন এবং তার যেরূপ ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন, তাঁর এই বইখানি তারই সামগ্রিক চিত্র।

প্রেম ও মৃত্যু সম্বন্ধে ভারতীয় ভাবনা নিবেদিতা যেরূপ বুঝেছিলেন তাই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং সে সব রচনারই সংগ্রহ *An Indian Study of Life and Death, Studies from an Eastern Home*—ভারতীয় পরিবারে ভারতীয় জীবনের সূক্ষ্ম গতি-প্রকৃতির লিপি। ভগিনী নিবেদিতার জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর যে গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে তার দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে কতগুলো বক্তৃতা ও প্রবন্ধ আছে। সেগুলোতে শুধু যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকসম্পাত করা হয়েছে তা নয়, সেগুলো পাঠে পাঠকের পরিপ্রেক্ষিত নূতনভাবে গড়ে ওঠে। এ সব বিষয়ের মধ্যে আছে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর বিচিত্র প্রভাব, ভারতের দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার অগ্রগতি, ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার ও এশিয়ায় ইসলাম। ইসলাম সম্বন্ধে নিবেদিতার মতে এ কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় ইসলামের দেশের মধ্যেই শেকড় গাঁথা প্রয়োজন। তাঁর আত্মজীবনী-মূলক গ্রন্থ *How and why I adopted Hinduism* বিশেষভাবে আগ্রহোদ্দীপক রচনা।

ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের কাজ সম্বন্ধে নিবেদিতা আনন্দপ্রদ প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা পরিবেশন করেছেন। য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ রেণেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে সে সব শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধনে খুবই সহায়তা হয়। যেসব কাহিনীতে হিন্দু জীবনধারার পটভূমি ব্যাখ্যাত আছে তাদেরই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে নিবেদিতার *Cradle Tales of Hinduism* আহৃত হয়েছে। *Religion and Dharma* বইয়ে ধর্মের প্রকাশ ও প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী রয়েছে। *Aggressive Hinduism* নামক বইয়ে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র পুণর্গঠনের জন্য ধর্মকে সক্রিয় করে তোলার প্রয়োজন অনুশীলিত।

Foot Falls of Indian History-এর শুরু এই আশ্চর্য কবিতাটি দিয়ে :

শুনি মোরা শুনি মাগো তব পদধ্বনি
যুগ যুগ ধরি তাহা মৃদু মন্দ স্বরে
পৃথিবী স্পর্শ করে এখানে ওখানে।
তব পদচিহ্ন পরে ফোটে যে কমল
নগরী ঐতিহাসিক তারা হয় সবে,
প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্য, প্রাচীন মন্দির
মহৎ আদর্শ তরে মহৎ সাধনা,
ন্যায়ের লাগিয়া যেই কঠোর সংগ্রাম—
কোথা নিয়ে যায় তারা, ওগো মা জননী,
কোথায় চলেছে নিয়ে মাগো তব পদধ্বনি ?

বুঝিবারে তাহাদের অর্থ প্রাণ ভরে
শকতি মোদের দাও, দাও পরিজ্ঞান,
মানুষ যে ভাবনার পায় না নাগাল
সেই পরিজ্ঞান তাহা দিবে স্তব্ধ করি।
কোথা নিয়ে যায় তারা, ওগো মা জননী,
কোথায় চলেছে নিয়ে, মাগো তব পদধ্বনি ?

কাছে এসো, হে জননী, মুক্তিদাত্রী তুমি
তোমার সন্তান মোরা, তোমাতে পালিত।
মোদের হৃদয়ে হোক তব পদপাত
ভূম্যা দেবী গো, মোরা একান্ত তোমার
কোথা নিয়ে যায় তারা, ওগো মা জননী,
কোথায় চলেছে নিয়ে, মাগো তব পদধ্বনি ?

মানুষের চরিত্রে স্থানকালের প্রভাব নিবেদিতা যে স্পষ্টরূপে চিত্রিত করেছেন, কট্টর মার্কসবাদীরও তাতে আনন্দ করার কারণ আছে। তাই তিনি পয়গম্বরের ভূমিকাও মহৎ জাতিস্রষ্টার ভূমিকারূপে দেখেছিলেন কারণ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উপজাতিগুলিকে মিলিয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। যুগের পর যুগে যে সব সামাজিক ও ধার্মিক আন্দোলন এসেছে এবং সেসব ইতিহাসে যে ছাপ রেখে গেছে তারই মনোমুগ্ধকর কাহিনী ঐ বই।

প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার জন্য কী কী প্রয়োজন *Hints on National*

Education in India বইটি তারই এক সুনিপুণ আলোচনা। বইটির উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে শিক্ষিত তরুণদের একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আবশ্যিক করতে হবে। বইটিতে যে কয়টি রচনা আছে তাতে (1) শিক্ষাকে ভারত-বাসীর জীবন সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে (2) জ্ঞানলাভের জন্য মানসিক প্রস্তুতি—সমাজে যে সব ধারণা কল্পনা প্রচলিত আছে সে সব আয়ত্ত করা এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশকে বর্ণনা করা হয়েছে শিক্ষার তিন উপাদানরূপে (3) এ কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে ভাবাবেগকে বুদ্ধিবৃত্তিরই ন্যায় নিয়ন্ত্রণে রেখে চালানো প্রয়োজন (4) শিক্ষাকে জাতিগঠনের কর্তব্যে নিয়োজিত করার প্রয়োজন ব'লে নির্দেশিত হয়েছে (5) জাতীয় ইতিহাস ও ভূগোল ভিত্তিক জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান। এর পরে ভগিনী নিবেদিতা বিদেশী সংস্কৃতি বিদেশী বলেই তার জন্য উতলা হওয়া যে মোহমাত্র, সে সম্বন্ধে লিখেছেন। নানা লেখা লিখতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি। এ বইয়েও লিখেছেন ভারতীয় নারীর সঠিক উপযোগী শিক্ষা। এরই আনুষঙ্গিক *The Project of the Ramakrishna School for Girls, Suggestion for the Indian Vivekananda Societies* শীর্ষক প্রবন্ধে যুবকদের সমাজসেবার কাজে শিক্ষা পদ্ধতি দেওয়ার ও উদ্দেশ্য আলোচিত হয়েছে। *Notes on Historical Research* ইতিহাসের ছাত্রদের মনোযোগ কতগুলো বিশেষ দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। *A Note on Co-operation* সমবায় সমিতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, এর মন্তব্য বেশ জোরালা। *The Place of Kindergarten in Indian Schools* অতি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক সন্দর্ভ। *Manual Training as Part of General Education in India* বইটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এক পূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা। 1906 সালে প্রকাশিত *Glimpses of Famine and Flood in East Bengal*-এর শুরুতে আছে এ কয়টি সুন্দর পংক্তি :

> ভারতেও এমন কোনো অঞ্চল নেই যার সঙ্গে ব্যাপ্তিতে এবং উর্বরতায় পূর্ববঙ্গীয় দূরবিস্তৃত ব-দ্বীপ জাতীয় ভূমির তুলনা করার কথা ভাবা যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের শেষ মোহানা অবধি দক্ষিণ, পশ্চিমে কলকাতা থেকে

শুরু ক'রে পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে ঢাকা ও ময়মনসিং—ত্রিভুজাকার এই দেশ। কাক উপর দিয়ে সোজা উড়ে গেলে যতটা দূরত্ব সে মাপে প্রত্যেক দিকে দু'শো মাইল জুড়ে প্রসারিত। পৃথিবীর উপরে সব চেয়ে স্পষ্ট রং সবুজ ও নীলে সে আঁকা। সবুজ সে মাঠে ও বনে, তালগাছের সারিতে ও বাগানে, শস্যে নীল সর্বত্র—নীল, নীল আর শুধুই নীল—উপরের আকাশে ও নীচে নীলাম্বুরাশিতে। হল্যাণ্ড—এমন কি ভেনিসকে যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছেও এ দেশ বোধ হ'য় সূক্ষ্ম সব ইঙ্গিতে, সুদূরে দেখা সৌন্দর্যের স্মৃতিতে পূর্ণ। কারণ, এ দেশটিকেও চারদিকের জলরাশির মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে—তবে মানুষের হাতে নয়। এ দেশও আকাশের অবিচ্ছিন্ন অর্ধ-গোলাকার ছাদের নীচে নিশ্চল এবং কিসের যেন অর্ধপ্রত্যাশী হ'যে পড়ে আছে। এই দেশেও সহসা দূরের মাঠের উপর দিয়ে সাদা পাল সহসা দেখা দিতে পারে। এ দেশও মানুষেব উপর সে প্রশান্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করতে পারে—যে প্রশান্তি অনুভব না করে পারা যায় না, বিরাট অসীমের উপস্থিতিতে অন্তহীন সসীমের উপর সেই প্রশান্তি নেমে আসে।

পূর্ববঙ্গে ত্রাণকার্য্য করতে গিয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছিল বইটি তারই বর্ণনা, সে বর্ণনা যেন একেবারে মাটি থেকে আহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ—বর্তমান বাংলাদেশকে—এখনও পর্য্যন্ত যে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে এই বইয়ের বহু মন্তব্যের এখনও প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান।

Lambs Among Wolves বইটি য়ুরোপীয় পাদ্রীরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অনেক সময়েই যে বিকৃত মত পোষণ করতো তারই তীব্র সমালোচনা।

মোটের উপর নিবেদিতার সৃষ্ট সাহিত্য ভারতীয় জীবনের দৃশ্যাবলী একটি চিত্রস্বরূপ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করেছে। এ সাহিত্য ভারতীয় সমাজের জটিলতা গভীরভাবে ভেদ করেছে; ভারত নামধারী ভূখণ্ডের জলবায়ু, অবস্থা, ঐতিহ্য ও সমস্যা ভারতীয়ের যে অস্তিত্ব গড়ে তুলেছে এ সাহিত্য পাঠককে সে অস্তিত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার ও নিজের জীবনকে তারই মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবার ক্ষমতা অর্পণ করেছে।